Barcode - 4990010059611
Title - Bishwa Parichai Ed.5th
Subject - Space Sciences
Author - Tagore, Rabindranath
Language - bengali
Pages - 158
Publication Year - 1939
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 059611

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

T 4
34·16

বিশ্বপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ	আশ্বিন, ১৩৩৬
দ্বিতীয় সংস্করণ	পৌষ, ১৩৪৪
পুনর্মুদ্রণ	মাঘ, ১৩৪৬
তৃতীয় সংস্করণ	শ্রাবণ, ১৩৫২
চতুর্থ সংস্করণ	পৌষ, ১৩৫৬
পঞ্চম সংস্করণ	পৌষ, ১৩৫৮
পুনর্মুদ্রণ	চৈত্র, ১৩৬৩
পুনর্মুদ্রণ	চৈত্র ১৩৭০

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রকাশক— শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

মুদ্রাকর— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হোলো না। কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমতো নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হোলো। যাই হোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন

ক্ষমা করবে না। তবু সাধ্যমতো যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত আমি কর্তব্যবোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্রমনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।

আমার কৈফিয়তটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হল, তাহলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।

বিশ্বজগৎ আপন অতিছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি-বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ-লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব

হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হোলো তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব অল্পমাত্র দূর করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হোলে তারাই সবচেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারি মতো আনাড়ির দল। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।

আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের

অস্থ ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয় দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে, জল গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারি বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে। যে ঘটনাকে স্বতই সহজ বলে বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা সহজ নয় এই কথাটা বোধ হয় সেই প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তার পরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রং-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে

দেওয়া নয়, পূর্ব থেকে তাদের জ্যোতিষ্কের দূরত্বমাপা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরো হোলো। ইংরেজি ভাষা আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্রতার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে না। জলস্থল বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না-বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়ো-বয়সের পাঠ্য-সাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি;

কতটা বুঝেছি তার সম্পূর্ণ হিসাব নিইনি, হিসাবের বাইরেও তারা একরকম ক'রে অনেকখানি যোগায় যা সেটা অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিল-মার্কার অধিকারগম্য নয়, কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এই রকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয়নি। স্যর রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্‌স্, ফ্লামারিয় প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি— গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির একসেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।

আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃততত্ত্বে— বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝিনি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।— মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথালাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম করে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয়নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্বাজাতের জিনিস। দাঁত-ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবেন— এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে

ছেলেদের পাঠ্যটিকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয় তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা ক'রে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে হল যখন ভালোবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার মতো পুঁথিটিকে প্রায় আগাগোড়া ফেলিয়ে রাটি ভরতি করার চলগত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে মেশাল জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হোতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলিনি।

শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম. এসসি. তোমাদেরি ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁর উপরেই দিয়েছিলেম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম

না, তাছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সাহসে কুলোত না। তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।

আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হোলো আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন ও পড়ে খুশি হয়েছেন এইটেতেই আমার সবচেয়ে লাভ।

আমার অসুস্থ অবস্থায় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যত্ন ক'রে প্রুফ সংশোধন ক'রে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন; এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতন
৭ আশ্বিন, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই অল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল। আশা ছিল বিষয়বস্তুর ত্রুটিগুলির সংশোধন হোতে পারবে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। কিছুদিন অপেক্ষার পর আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন এবং বম্বাই থেকে শ্রীযুক্ত ইন্দুমোহন সোম বিশেষ যত্ন করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার সুযোগ হোলো। তাঁরা অযাচিতভাবে এই উপকার করলেন সেজন্যে আমি তাঁদের কাছে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞ আছি। এই সঙ্গে পূর্বসংস্করণের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কালিম্পং
২৭.৫.১৯৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থে যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্যগোচর হয়েছে সে সমস্তই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ মনোযোগ করে সংশোধিত করেছেন—তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শান্তিনিকেতন
২.৯.১৯৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অধ্যায়সূচী

পরমাণুলোক	১
নক্ষত্রলোক	৪৯
সৌরজগৎ	৭১
গ্রহলোক	৮২
ভূলোক	১০৪
উপসংহার	১২১

চিত্রসূচী

অ্যান্ড্রোমীডার নীহারিকা	১
হ্যালির ধূমকেতু, ১৯১০	৮৫
শনি ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনা	৯৭

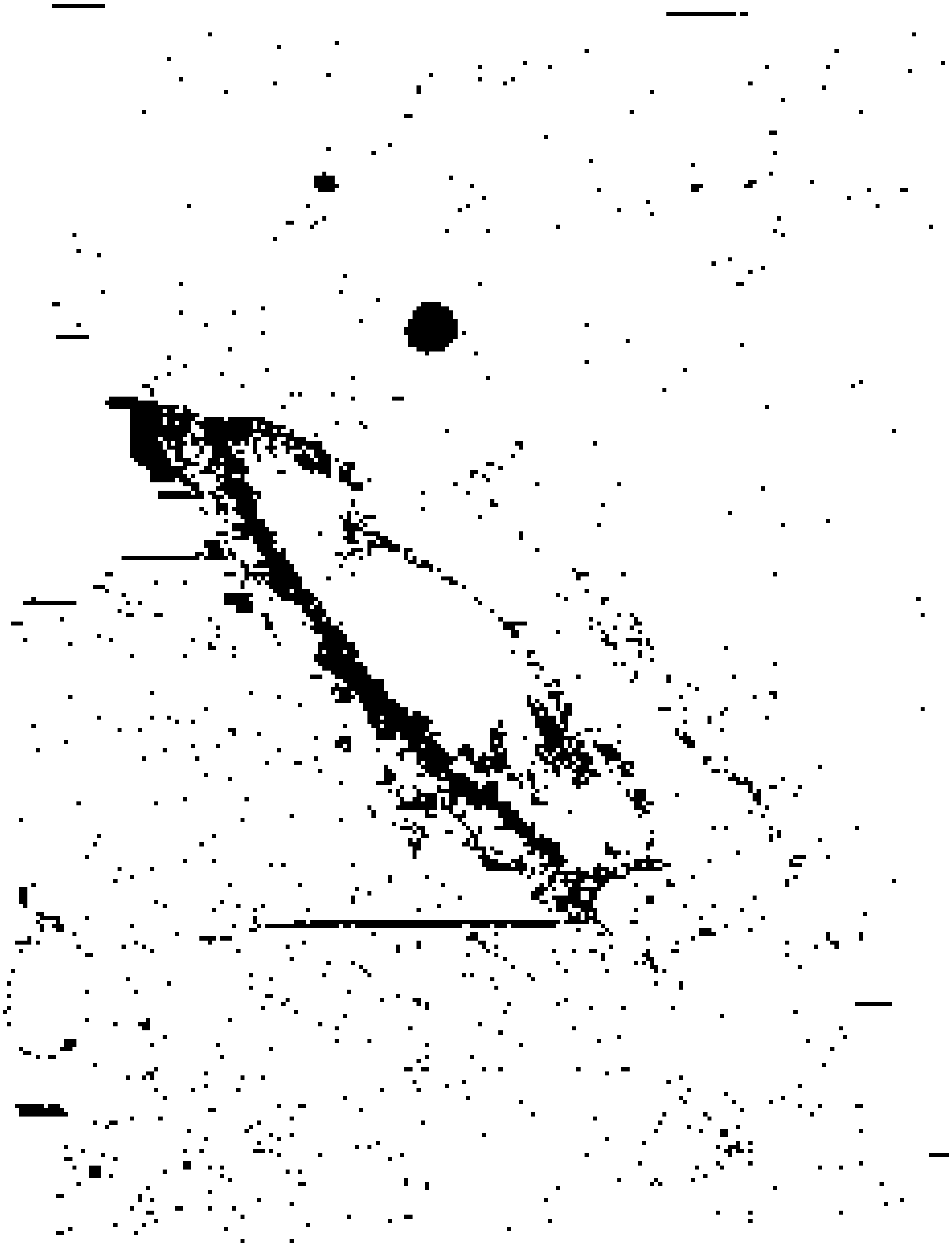

পরমাণুলোক

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ। এইগুলিকে বলি অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ লাগা, আমাদের সুখদুঃখ।

আমাদের এই সব অনুভূতির সীমানা বেশি বড়ো নয়। আমরা কতদূরই বা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি। অন্যান্য বোধশক্তিরও দৌড় বেশি নয়। তার মানে আমরা যেটুকু বোধশক্তির সম্বল নিয়ে এসেছি সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলার হিসাবমতো। আরো কিছু বাড়তি হাতে থাকে। তাতেই আমরা পশুর কোঠা পেরিয়ে মানুষের কোঠায় পৌঁছতে পারি।

যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে সূর্য। এই সূর্য আমাদের চারদিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে; পৃথিবীকে ছাড়িয়ে বাইরে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে; তখন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে

পারি এতটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু কতটা যে দূরে তা কেবল অঙ্কচিহ্নে ধরতে পারিনে।

সেই দূরত্বের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে। সেখান থেকে শব্দ আসে না, কেননা শব্দের দৌড় হাওয়ার যোগে। এই হাওয়া চাদরের মতোই পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে। এই হাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই শব্দ জাগায় এবং শব্দের ঢেউ চালাচালি করে। পৃথিবীর বাইরে ঘ্রাণ আর স্বাদের কোনো অর্থই নেই। আমাদের স্পর্শ-বোধের সঙ্গে আমাদের আর-একটা বোধ আছে সেটা তাপের বোধ। পৃথিবীর বাইরের সঙ্গে আমাদের এই বোধটার সম্বন্ধ এক জায়গায় খুবই বেশি আছে। সূর্যের থেকে রোদ্দুর আসে, রোদ্দুর থেকে পাই তাপ। সেই তাপে আমাদের প্রাণ। সূর্যের চেয়ে লক্ষগুণ-তাপ নক্ষত্র আছে। তার তাপ আমাদের কাছে পৌঁছয় না। কিন্তু সূর্যকে যে আমাদের পর বলা যায় না। অথচ যে-সব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এই নক্ষত্রজগৎ, সূর্য তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আমাদের আত্মীয়। তবু মানতে হবে, সূর্য পৃথিবীর থেকে আছে দূরে। কম দূরে নয়, প্রায় ন কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল তার দূরত্ব। শুনে চমকে উঠলে চলবে না। যে নক্ষত্রজগতে আমরা আছি এখানে ঐ দূরত্বটা নক্ষত্রলোকের সকলের চেয়ে নিচের

তাদের কোনো নক্ষত্রই এর চেয়ে পৃথিবীর কাছে নেই।

এই সব দূরের কথা শুনে আমাদের মনে চমক লাগে তার কারণ হচ্ছে মাটির উপরে এই দিকটি, এই পৃথিবী, অতি ছোটো। পৃথিবীর বাইরের ব্যাপ্তি অর্থাৎ এর বিপুল-[illegible] মাত্র। বিশ্বের পরিচয় যতই এগোবে ততই দেখতে পাবে অনেকের [illegible] এই বৈচিত্র্য ব্যাপারের সংখ্যাটা অনেক কম। পূর্বেই বলেছি আমাদের বোধশক্তির সীমা অতি ছোটো। সবটা ঠিক বুঝে নিতে আমাদের অনেকবার ঠেকাতে হয় তা কতটুকুই বা। ঐ সামান্য দূরত্বের মধ্যেই আমাদের দেখার আকারের চেনাশোনার বহাল নির্দিষ্ট।

কিন্তু শুধু যখন ছুটে গেল, তখন আমাদের অনুভূতির সামান্য সীমানার মধ্যেই বৃহৎ বিশ্ব নিজেকে নিতান্ত ছোটো করে একটুখানি আভাসে জানান দিলে, তা না জেনে জানা যেতেই না, কেননা বড়ো দেখার চোখ আমাদের নয়। [illegible] এইটুকু দেখবার মাপে নিলে। অতটুকু তাদের অনুভূতিতে যা ছিল ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট থাকতো। মানুষ থাকে না। ইন্দ্রিয়বোধের জিনিসটার একটু ইশারা মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির দৌড় তার চোখের চেয়ে আরো অনেক বেশি, কাটিয়ে সকল

সৌরমণ্ডল সমেতই যে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে। সে এই প্রকাণ্ড জগতের ফাঁকাও মাপের বাইরে আকারে বেয়াল, অনুভূতির ছেলে-ভুলোনো স্বপ্ন দিয়ে বানিয়ে রাখে। ন কোটি ত্রিশ লাখ মাইলকে আমরা কোনোমতেই অনুভব করতে পারিনে, কিন্তু বুদ্ধি তার মানে না, হিসেব কষতে বসল।

বাইরের বিশ্বপরিচিতির কথা থাক্‌। আমরা যে-পৃথিবীতে আছি, তার চেয়ে কাছে তো আর কিছুই নেই, তবু এর সমস্তটাকে এক ক'রে দেখা আমাদের চোখের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একটি ছোটো গ্লোবে যদি তার ম্যাপ আঁকা দেখি, তাহলে পৃথিবীর সমস্তটাকে জানার একটুখানি গোড়াপত্তন হয়। আয়তন হিসাবে গ্লোবটি পৃথিবীর অনেক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আমাদের অল্প সব চোখ যদি দিয়ে কেবলমাত্র দৃষ্টিবোধের আঁচড়-কাটা পরিচয় এতে সহজ। বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে এ একেবারেই ফাঁকা। এর সমগ্রতার শক্তি আমাদের নেই ব'লেই ছোটো ক'রেই দেখতে হোলো।

প্রতিবিম্বে বিশ্বকে এই যে ছোটো ক'রেই দেখানো হয়েছে সেও আমাদের মাথার উপরকার আকাশের কোলে। দৃষ্টিবোধ ছাড়া, অন্য কোনো বোধ এর মধ্যে জায়গা পায় না। যা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে যায় এত বড়ো জিনিসকে দিকসীমানায় বদ্ধ এই আকাশটুকুর মধ্যে আমাদের কাছে ধরা হোলো।

পরমাণুলোক

কতই ছোটো ক'রে ধরা হয়েছে তার একটা আন্দাজ পেতে হোলে সূর্যের দৃষ্টান্ত মনে আনতে হবে। স্বভাবতই আমরা যত কিছু বড়ো জিনিসকে জানি বা মনে আনতে পারি তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো এই পৃথিবী। একে আমরা অংশ অংশ করেই দেখতে পারি। একসঙ্গে সবটার প্রকৃত ধারণা আমাদের মনের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়ো। এত বড়ো সূর্য আকাশের একটি ধারে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে একটি সোনার থালার মতো। সূর্যের চিত্রকরের মতো ক্ষুদ্র কোলাপাতের মতন করেই পাই আর তার পরে যখন দেখি ভোরবেলায় আমাদের আমবাগানের পিছন থেকে সোনার গোলকটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে, আকাশমণ্ডল গাছপালা আলোকিত হয়ে উঠেছে, তখন মনে ভাবি আমাদের কী রকম ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের চোখ দিয়েছে আমাদের জীবনের কাজে এর বেশি প্রয়োজনের কোনো দরকার নেই। না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী ক'রে। ঐ সূর্য আপন বিরাট স্বরূপে যদি আমাদের অনুভূতির অণুমাত্রও কাছে আসত তাহলে তো আমরা মুহূর্তেই লোপ পেয়ে যেতুম। এই তো গেল সূর্য। এই সূর্যের চেয়ে আরো অনেক গুণ বড়ো আছে আরো অনেক অনেক নক্ষত্র। তাদের দেখছি কতকগুলি আলোর ফুটকির মতো। যে দূরত্বের মধ্যে এই সব নক্ষত্র ছড়ানো,

ছুটলে তার কিনারায় পৌঁছানো যায় না। বিশ্বজগতের বাকি এই আকাশটাকে মেপে যে কত বড়ো সে কথা আর-একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের অনুভবে পৃথিবীর বাইরে থেকে একটা খুব বড়ো খবর খুব জোরের সঙ্গে এসে পৌঁচচ্ছে, সে হচ্ছে রৌদ্রের উত্তাপ। এ খবরটা ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের। কিন্তু ঐ যে অপরিমিত আকাশে আছে বহুকোটি নক্ষত্র, তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি সূর্যের চেয়ে কত গুণ বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু আমাদের অনুভবে তাদের সম্মিলিত গরম পাইনে এতটা বোঝা গেল যে বিশ্বলোকের অধিকাংশই আমাদের আকাশটা ছুঁতেই পারে না। কত দূরের এই পথ, কত প্রকাণ্ড এই আকাশ। তাদের অস্তিত্বকে স্পর্শ-করা ন কোটি মাইল তার কাছে তুচ্ছ। বড়ো, মস্ত রান্নাঘরে যে চুলি জ্বলছে তার কাছে বসা অসম্ভব হয়, কিন্তু ঢের বাড়ির কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্নাঘরের যে মিলিত আগুন বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি। নক্ষত্রলোকের ব্যাপারটাও সেই রকম। সেখানকার আকাশের ঘটা মস্ত প্রকাণ্ড লোক, তার চারদিকের আকাশটা আরো অনেক প্রকাণ্ড।

এই কোটি সূর্য থেকে নক্ষত্রদের অস্তিত্বের খবর এনে দিচ্ছে কিসে। সহজ উত্তর হচ্ছে আলো। কিন্তু আলো যে চুপচাপ বসে খবর আউড়িয়ে যায় না, আলো যে তাদের

লেখালিখি মতো খবর পিঠে করে নিয়ে দৌড়ে চলে, বিজ্ঞানের এই একটা বড় আবিষ্কার। চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো কিছুরই নেই। আমরা ছোটো পৃথিবীর মানুষ, তাই এতকাল আলোকের সঙ্গে ছোটো বড়ো চলার কথাটা জানবার সুযোগ পাইনি। একদিন বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ণ হিসাবের কাছে ধরা পড়ে গেল, আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। এমন একটা বেগ যা মনে করা যায়, মনে আনা যায় না। বুদ্ধিতে যার পরীক্ষা হয়, অনুভবে হয় না। আলোর এই চলনের দৌড় অনুভবে বুঝব, এই পৃথিবীটুকুতে এত বড়ো জায়গা পাব কোথায়। এইটুকুর মধ্যে ওর চলাকে আমরা না-চলারই মতোই দেখে আসছি। পরখ করবার মতো স্থান পাওয়া যায় মহাশূন্যে। সূর্য আছে সেই মহাশূন্যের যে দূরত্বটা নিয়ে, সে হল ন'কোটি মাইল ছাড়িয়ে, জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে খুব বেশি নয়।

সুতরাং এইটুকু দূরত্বের মধ্যে 'অপেক্ষাকৃত' ছোটো মাপে মানুষ আলোর দৌড় দেখতে পেল। যখন দেখল যে, এই শূন্য পেরিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় সাড়ে আট মিনিট, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির সামনে সূর্য যখন উপস্থিত, আসলে তার আগেই সে এসেছে! এই আগমনের খবরটি জানাতে আলো-দূতের মিনিট আষ্টেক দেরি হোলো।

এইটুকু দেরিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। প্রায় তাজা খবরই পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়া-পড়শি বলতে হবে, যখন সে জানিয়ে দিল "এই যে আছি" তখন থেকে সেই বার্তা বয়ে আনতে আলোর সময় লাগছে-চার বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেল সেটা চার বছরের বাসি। এইখানে দাঁড়ি টানলেই চলত, কিন্তু আরো দূরের নক্ষত্র আছে যেখান থেকে আলো আসতে বহু লক্ষ বছর লাগে।

আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর থেকে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভঙ্গিটা কী রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সে কথা ভেবে পাওয়া যায় না; কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে যে ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়ি খবর তার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ-নিয়ে হাজির হোলো, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে; অতি সূক্ষ্ম ছিটে-গুলির মতো ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উলটো খবরের মিলন হোলো কোন্‌খানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উলটো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে বাইরে যেটা ঘটছে-

সেটা একটা-কিছু ঢেউ তার বদল, আর কিসের ঢেউ আমরা তা জানি নে, না একটা, না একটি, তাকে ঈথর বলে আসছে।— এর মানে কী, কোনো পণ্ডিত তা বলতে পারবেন না।

যা চোখে দেখা যায় না, যা দেখাশোনার বাইরে, তার এত সূক্ষ্ম এবং এত দূরের খবর পাওয়া গেল কী করে, এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। নিশ্চিত জবাব আছে, সাধারণের এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই: যাঁরা খবর সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ তাঁদের জ্ঞানের তপস্যা, এমনকি দুর্গম তাঁদের সন্ধানের পথ। তাঁদের কথা যাচাই করে নিতে যে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার, তার আমাদের অনেকের নেই। অল্প নিয়ে, ভিত্তি বিশ্বাস করেই চলতে হবে। আমাদের রাস্তা খোলাই আছে। সেই রাস্তায় চলবার সাধনা যদি করি, শক্তি যদি থাকে, তবে একদিন এ-সব বিষয় নিয়ে সওয়াল জবাব সহজেই করতে পারবে।

সাধারণ আলোর ঢেউয়ের কথাই বলে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি পড়ে না। এইখানে বলে রাখা ভালো, যে-আলো চোখে পড়ে না, চলতি ভাষায় তাকে আলো বলে না। কিন্তু দৃশ্যই হোক অদৃশ্যই হোক, একটা কোনো শক্তির এই ধরনের ঢেউ-খেলিয়ে চলাটা যখন উভয়েরই স্বভাব, তখন বিজ্ঞানের বইয়ে এদের

পৃথক নাম অনাবশ্যক। বড়ো ভাই মামলাবাজ, ছোটো ভাইকে কেউ মানে না, শুধু বংশগত ঐক্য ধরে উভয়েরই থাকে একই উপাধি, এও তেমনি।

আলোর ঢেউয়ের আপন দলের আরো একটি ঢেউ আছে, সেটা চোখে দেখিনে, স্পর্শে বুঝি। সেটা তাপের ঢেউ। এটির কাছে তার খুবই প্রতাপ। এমনিতরো আলোর ঢেউ-জাতীয় নানা পদার্থের কোনোটা দেখা যায়, কোনোটা স্পর্শে বোঝা যায়, কোনোটাকে শুধু আলোকচিত্রে জানি চেনার পটে পড়েই অভিজ্ঞতায় বুঝি, কোনোটাকে জানাও যায় না, স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত আলো-তরঙ্গের ফিরিস্তি যদি এক লাইনে লিখতে হয়, তবে তাকে অনেক দূর যেতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে প্রকাশে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর লোহা সোনা রূপো বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শস্থল। কিন্তু এ-কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাদের অণুপরমাণু, যাদের অতি সূক্ষ্ম বলেই আমরা দেখতে পাইনে, অথচ যাদের মিলিয়ে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরি, তারা সকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। ঠাণ্ডা যখন থাকে তখনও কাঁপছে, তার কাঁপুনি যখন আরো চড়ে ওঠে তখন গরম হয়ে বাইরে থেকেই ধরা পড়ে আমাদের

বোধশক্তিতে। আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অস্থির হয়ে ওঠে যে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের ঢেউ আমাদের শরীরের স্পর্শনাড়ীকে ঘা মেরে তার মধ্য দিয়ে যে খবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম। বস্তুত গরমটা আমাদের খবরে; অর্থাৎ খবরে চোখে, গরম মানুষ পায়ে!

ছেলেবেলায় যখন একদিন মাস্টারমশায় দেখিয়ে দিলেন লোহার টুকরো আগুনে তাতালে প্রথমে হয় গরম, তার পরে হয় লাল টকটকে, তার পরে হয় সাদা জ্বলজ্বলে, তখন মনে আছে তখন আমাকে এই কথা নিয়ে ভাবিয়েছিল যে, আগুন তো কোনো একটা দ্রব্য নয় যেটা লোহার বাইরে থেকে মিশিয়ে লোহাকে দিয়ে এমনতরো চেহারা বদল করাতে পারে। তার পরে আজ শুনছি তাতে তাপ দিলে এই লোহাটা গ্যাস হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধেই আজকের কালের কথা, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিশিয়ে আছে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলো। ঐ সাত রঙের রশ্মির দোলন, গুটিয়ে ফেললে দেখায় লাল, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাদারঙা। সেকালে ছিল ঝাড়লণ্ঠন, বিজলিবাতির ঝাড়ায় তাতে ঝুলছে লোলকগুলো। এই কাচের গায়ে ছিল তিনশির-ওয়ালা কাচের পরকলা। এই রকম তিনপিঠওয়ালা কাচের

হয়, এই যে, সব রঙের মিলে রোদ্দুর এসে তার থেকে নানা রঙের আলো বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পরে রং বিছানো হয়: বেগনি (violet), অতিনীল (indigo), নীল (blue), সবুজ (green), হলদে (yellow), নারাঙি (orange) আর লাল (red)। এই সাতটি রং চোখে দেখা যায় কিন্তু এদের দুই প্রান্তের বাইরেও রয়েছে আলো, অনেক ছোটো বড়ো ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ চেতনায় ধরা পড়ে না। সেই আলোর যে প্রান্তে বেগনি রঙের পারের আলোকে বলে ultra-violet light, সহজ বাংলায় বলা যাক বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লালের এলাকায় এসে পৌঁছয়নি, রয়েছে তার আগের পারে এসে, বলে infra-red light, আমরা বলতে পারি লাল-উজানি আলো। স্যর উইলিয়ম হর্শেল ছিলেন এক মস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন সূর্যকিরণ সাতরঙা ছটা। তাদের রং-করা আলো-ধারের মত নিয়ে এক-একটা রঙের আলো ধরে দেখলেন। লাল রঙের দিকে উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। লাল পেরিয়ে যখন নিয়ে গেলেন সেখানে অন্ধকারে, সেখানেও গরম থাকতে চায় না। বোঝা গেল অদৃশ্য আলো আছে ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তার পর এলেন এক জর্মান রসায়নী। একটা ফোটোগ্রাফিক

প্রেত নিয়ে পরীক্ষায় লাগলেন। এই প্রেতে লাল থেকে বেগনি পর্যন্ত সাতটা রঙের সাড়া পাওয়া গেল। শেষে বেগনি, পেরিয়ে চললেন অন্ধকারে, সেখানে চোখে যা ধরা দেয় না প্লেটে তা ধরা পড়ল। দেখা গেল আবার উল্টোদিকে লাল রঙের দিকে তাপ রশ্মিময় চিহ্ন বেগনি-পারের দিকে। এতকালে যত অদ্ভুত অ-দেখা রশ্মির দলেরই পাইতর, অন্ধকারে পড়ে গেছে! সব এদিকে আসল শুরু আলোর সন্ধান, তাতেই সাড়া মেলেই আমন ফেরারী নয়। বিজ্ঞানের ফটোতে আলোর সীমানা পেরিয়ে সাড়া-রশ্মির দেশ ছাড়িয়ে পড়ে রয়েছে! লাল-উজানি আলোর দিকে এসে আজ দেখা দিল যে ছোট ছোট ঢেউ বয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে বেতার-বার্তা, বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিদ্যুৎ রশ্মির আলো, যে আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

আলো জিনিসটাতে কেবল যে নক্ষত্রের অস্তিত্বের খবর দেয় তা নয়, তাদের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ মিশিয়ে আছে, আলো সে খবরও আলোর রঙ দিয়ে আমার কাছে দিয়েছে। কেমন করে আনায় সেটা বুঝিয়ে বলা যাক।

ত্রিকোণ কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো যখন পার করলে তার সাতটা রঙের পরিচয় পড়ে পরে দেখিয়ে

পড়ে। কোনো একটি শক্ত জিনিস যখনই জ্বলে উঠে তার আলো যখন ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে তখন এই সাদা আলো ভাগ করলে সাত রঙের ছটা পাশাপাশি দেখা যায়। তাদের মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু লোহাকে গ্যাস করলে অর্থাৎ যখন তা বাষ্প হয়ে যায় তখন ঐ বাষ্পের ভিতর দিয়ে তার আলো ছাঁকলে বর্ণচ্ছটায় একটানা আলো পাই নে। দেখা যায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা, তাদের মধ্যে মধ্যে থাকে ফাঁকা জায়গা। এই বর্ণালোক-চিহ্নপাতের নাম দেওয়া যাক বর্ণলিপি।

এই লিপিতে দেখা গেছে বাষ্প অবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছটা স্বতন্ত্র। নুনের মধ্যে সোডিয়ম নামক এক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। সেটা নিয়ে আগুনে তাপে গ্যাস করে জ্বালালে বর্ণলিপিতে তার আলোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দেখা যায় দুটি হলদে রেখা। আর কোনো রং পাই নে। সোডিয়ম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসেরই বর্ণচ্ছটায় ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ দুটি রেখা মেলে না। ঐ দুটি রেখা যেখানকারই আলোর বর্ণলিপিতে দেখা যাবে বুঝব সেখানে সোডিয়ম আছেই।

কিন্তু দেখা যায় সূর্যের আলোর বর্ণচ্ছটায় সোডিয়মের নামের ঐ দুটি উজ্জ্বল হলদে রেখা চুরি গেছে, তার জায়গায় রয়েছে দুটো কালো দাগ। বিজ্ঞানী বলেন উজ্জ্বল সোডিয়ম

গ্যাসীয় জিনিসের আলো, সেই সাতরঙেরই অংশবিশেষ তারা ফাঁকের ভিতর দিয়ে আমাদের সমস্ত সম্পূর্ণ শোষিত হয়। এ শোষণ গ্যাসের অভাবেই যে কালো রেখার সৃষ্টি তা নয়। বস্তুত সূর্যের বর্ণচ্ছটায় যে সোডিয়াম গ্যাস পীত আলো আটক করে সেও আপন উত্তাপ অনুযায়ী আলো ছড়িয়ে দেয়, আলোকমণ্ডলের তুলনায় উত্তাপ কম বলে এর আলো হয় অনেকটা ম্লান। এই ম্লান আলো বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল আলোর পাশে কালোর মতো দেখায় :

মৌলিক জিনিস মাত্রেরই আলো থেকে তাদের প্রত্যেকটির বর্ণচ্ছটার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। এই বর্ণচ্ছটাগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই নির্ণয় করা চলবে তা সে যেখানেই থাকুক, কেবল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা চাই।

পৃথিবী থেকে যে ৯২টি মৌলিক পদার্থের খবর পাওয়া গেছে সূর্যে তার সবগুলিরই থাকা উচিত; কেননা পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত। প্রথম পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল ৬৬টি মাত্র জিনিস। বাকিগুলির কী হোলো সেই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। নূতন সন্ধানপথ বের করে সূর্যে আরো কতকগুলি মৌলিক জিনিস তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই খবর মিলেছে। অল্পই যেগুলি ধরা পড়ে না, মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ চাপা দেয়।

সব রং মিলে সূর্যের আলো সাদা, তবে কেন নানা জিনিসের নানা রং দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রং নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো-কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত-দেওয়া রংটাই আমাদের চোখের লাভ। যেটা গ্রহণ যে রংটা শুষে নেয় সে কারো ভোগে লাগে না, যে রংটা সে নেয় না, সেই উদ্বৃত্ত রংটাই আমাদের পাওনা। এক দেখনি। চুনি পাথর সূর্যকিরণের আর সব রকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রংকে। তার এই ত্যাগের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোনো খ্যাতি নেই। লাল রংটাই কেন যে ও নেয় না, আর নীল রঙের প্রতিই নীলা পাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জবাব ওদের পরমাণু-মণ্ডলে লুকোনো রইল। সূর্যের সব ঢেউকেই পাকা-চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা-চুল কোনো ঢেউই ফিরে দেয় না, অর্থাৎ আলোর কোনো অংশই তার কাছ থেকে ছাড় পায় না, তাই সে কালো। জগতের সব জিনিসই যদি সূর্যের সব রংই করত আত্মসাৎ তাহলে সেই কৃপণের জগৎটা দেখা দিত কালো হয়ে, অর্থাৎ দেখাই দিত না। যেমন অনেক বিদ্যোনার মাঝটা পেছনদিকেই পোস্টমাস্টার লক্ষ করে থাকে। অথচ কোনো আলোকেই যদি না নিত সবই হোত সাদা, তবে সেই একাকারে সব জিনিসেরই প্রভেদ যেত ঘুচে। যেন

আকাশটা সেখানের সব চিঠিই ডাক পাঠিয়ে একাকার করা হোত, কোনো স্বতন্ত্র খবরই পাওয়া যেত না। একই চেহারায় সবদিকে দেখতে দেখা যেত না। নানা-রঙের আর পূর্ণ থাকত কোনোদিকেই আমাদের দৃষ্টি ঠেকত না, অসীম দেখি তারা আলোর বেড়াবেড়ি।

সূর্যকিরণের মধ্যে রঙছাড়া এমন অনেক ঢেউ আছে, যারা দৃষ্টি অল্প পরিমাণে আমাদের চোখে অনুভব করতে পারিনে। এমন ঢেউও আছে যারা প্রচুর পরিমাণেই নেমে আসে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের আটক করে — নইলে জ্বলেপুড়ে মরতে হোত — সূর্যের যে পরিমাণ তাপ আমরা সইতে পারি প্রথম থেকেই তাকে নিয়ে আমাদের দেহযন্ত্রের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তার বাইরে আমাদের জীবনযাত্রার অধিকার বন্ধ।

বিশ্ববিধানে সমস্তটা না, আকাশের তারার পড়ে সব জ্যোতিষ্ক, নক্ষত্রলোক, আর সূর্য, সেও একটা সন্দেহ। মানুষের মনে একদিন এরা আশ্চর্য ঠেকিয়ে এসেছে। বর্তমান যুগে সমস্তটা মানুষকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রকায় লুকানো বিশ্ব, যা অতি সূক্ষ্ম, যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পদার্থ ভাগ করে দেখতে যাই তার ছোটোকার জিনিসটা কী, তাহলে পাওয়া যাবে ধুলোর

কণা। এখন তাকে আর টুকরো করা চলবে না এমন বস্তুর এই অতিসূক্ষ্ম টুকরোই মাটির ঘরের আদিম মালমশলা। তেমনি করেই মানুষ একদিন ভেবেছিল, বিশ্বের পদার্থগুলিকে ভাগ করতে করতে যখন এমন সূক্ষ্মে এসে ঠেকবে যে তাকে আর ভাগ করা যাবে না তখন সেইটেকেই বলব বিশ্বের আদিভূত, অর্থাৎ গোড়াকার সামগ্রী। আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম। এরা এত সূক্ষ্ম যে দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তবে মাপ হবে এক ইঞ্চি মাত্র।

সহজ উপায়ে ধুলোর কণাকে আর আমরা ভাগ করতে পারিনে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাড়নে বিশ্বের সকল সামগ্রীকে আরো অনেক বেশি সূক্ষ্মে নিয়ে যেতে পেরেছে। শেষকালে এসে ঠেকেছে বিরেনব্বইটা অমিশ্র পদার্থে। পণ্ডিতেরা বললেন এদেরই যোগ বিয়োগে জগতের যত কিছু জিনিস গড়া হয়েছে, এদের শরীরে ভেজালের লেশ নেই।

মনে করা যাক, মাটির ঘরের এক অংশ তৈরি খাঁটি মাটি দিয়ে, আর এক অংশ মাটিতে গোবরে মিশিয়ে। তাহলে সেখান খুঁড়ে দুরকম জিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধুলোর কণা, আর এক ধুলোর সঙ্গে মেশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিশ্বের সব জিনিস পরখ ক'রে বিজ্ঞানীরা তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক,

আর এক জাতের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোনো মিশল নেই, আর যৌগিক পদার্থে এক বা আরো বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনা মৌলিক, একে সাধারণ উপায়ে যত সূক্ষ্ম ভাগ করো সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জল যৌগিক, একে ভাগ করলে দুটো মৌলিক গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, একটির নাম অক্সিজেন আর একটির নাম হাইড্রোজেন। এই দুটি গ্যাস যখন আলাদা থাকে তখন তাদের এক রকমের গুণ, আর যেই তারা মিশে জল হল, অমনি তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই এই দশা। তারা আপনাদের মধ্যে আদিম আদি-পদার্থের পরিচয় গোপন করে। সেকালের এই সব আদিম পদার্থগুলোকেই একদিন বৈজ্ঞানিক ভেবেছিল জগতের মূল উপাদান বলে; সবাই বলেছিল, এদের ভেঙে আর একটুকুও ভাগ হয় না। কিন্তু এখনকালে তাদেরও ভাগ দেখছ। যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু, সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে, শক্তি বলা যায়।

আজকাল ইলেকট্রিসিটি শব্দটা খুব চলতি— ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক মশাল, ইলেকট্রিক পাখা এমনি আরো কত

কী। সকলেরই জানা আছে ওটা এক রকমের তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে যা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎ ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেকট্রিসিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। তাতে আশঙ্কা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেকট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বিদ্যুৎ।

এই বিদ্যুতের আছে দুই অংশের। বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর এক জাতের নাম নেগেটিভ। তর্জমা করলে দাঁড়ায় হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। এদের মেজাজ পরস্পরের উল্টো, এই বিপরীতকে মিলিয়ে নিয়ে হয়েছে সমস্ত যা-কিছু। অথচ পজিটিভের প্রতি পজিটিভের, নেগেটিভের প্রতি নেগেটিভের একটুও আকর্ষণের লক্ষণ নেই, এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে।

এই দুই জাতের অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতকণা জোট বেঁধেছে পরমাণুতে। এই দুই পক্ষকে নিয়ে প্রত্যেক পরমাণু যেন গড়েছে খুদে নিয়ম-বাঁধা সৌরমণ্ডলের মতো। সূর্য যেমন সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের লাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ কণাগুলোকে, আর তারা সার্কাসের ঘোড়ার মতো লাগামধারী পজিটিভের চারদিকে ঘুরছে।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে ৯ কোটি মাইলের দূরত্ব রক্ষা করে। আয়তনের তুলনায় প্রতিপরমাণুদের কক্ষপথের দূরত্ব অনুপাতে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। পরমাণু যে অণুতম আকাশ অধিকার করে আছে তার মধ্যেও দূরত্বের প্রভূত সমাবেশ আছে। ইতিপূর্বে নক্ষত্রলোকে দূরত্বের ও পরস্পর দূরত্বের অতি প্রকাণ্ডতার কথা বলেছি, কিন্তু তার ছোটোদিকেও বলা যেতে পারে তার প্রত্যক্ষ ছোটো। বৃহৎ একখণ্ডের সীমানা সংখ্যাতিরিক্ত দিয়ে সেই দিকে গেলে যেমন একের পিছনে শূন্য-পঙ্‌ক্তি অন্তহীন করতে হয় ক্ষুদ্রের প্রত্যেকতা সম্বন্ধে সেই একই কথা। তাতেও সংখ্যার কোঠা লম্বা লাইন জুড়ে দাঁড়ায়। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ আকাশে যে দূরত্ব বাঁচিয়ে প্রতিপরমাণুরা চলাফেরা করে তার উপমা-উপলক্ষ্যে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছেন হাওড়া স্টেশনের মতো মস্ত একটা স্টেশন থেকে আর সব কিছু জিনিস সরিয়ে দিয়ে কেবল গোটা পাঁচ-ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে তবেই তারই সঙ্গে তুলনা হতে পারে পরমাণুর আকাশবিহারী প্রতি-পরমাণুদের। কিন্তু এই ব্যাপক শূন্যের মধ্যে দূরবর্তী কয়েকটি চঞ্চল পদার্থকে তাড়িয়ে রাখবার জন্যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর প্রায় সমস্ত ভার সমস্ত শক্তি কাজ করছে। এরা না ঠেকালে পরমাণু-জগৎ ছারখার হয়ে যেত, তা হলে পরমাণু দিয়ে গড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব থাকত না।

পদার্থের মধ্যে অণুগুলি পরস্পর কাছাকাছি আছে একটা টানের শক্তিতে। তবু সোনার মতো নিরেট জিনিসের অণুরও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। সংখ্যা দিয়ে সেই অতি সূক্ষ্ম ফাঁকের পরিমাণ জানাতে চাইনে, তাতে মন পীড়িত হবে। প্রশ্ন উঠবে একটুও ফাঁক থাকে কেন, ঘেঁষে থাকে না কেন, কেন থাকে জমাট পদার্থ। এর একই অনুরূপ প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী কেন সূর্যের গায়ে গিয়ে এঁটে যায় না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা পিণ্ডে তাল পাকিয়ে যায় না কেন? এর উত্তর এই পৃথিবী সূর্যের টান মেনেও দৌড়ের বেগে তফাত থাকতে পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেশি হোত তাহলে টানের বাঁধন ছিঁড়ে শূন্যে বেরিয়ে পড়ত, দৌড়ের বেগ যদি ক্লান্ত হোত তাহলে সূর্য তাকে নিত আত্মসাৎ করে। অণুদের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় গতির বেগে, তারই বাঁধনের শক্তিকে ঠেলে রেখে দেয়। বায়বীয় পদার্থের গতির প্রাবল্য বেশি। অণুর দল এই অবস্থায় এত জোরবেগে চলে যে তাদের পরস্পরের মিল ঘটবার অবকাশ থাকে না। মাঝে মাঝে তাদের সংঘাত হয় কিন্তু মুহূর্তেই আবার যায় সরে। তরল পদার্থের আণবিক আকর্ষণের শক্তি সামান্য বলেই চলন বেগের ফলে তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার সুযোগ হয় না। নিরেট বস্তুতে বাঁধনের শক্তিটা অপেক্ষাকৃত প্রবল। তাতে অণুর দল সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর আটকা পড়ে থাকে। তাই

বলে তারা যে শান্ত থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে কম্পন চলছেই কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্বল্পপরিমিত।

অণুদের মধ্যে এই তিনজন কুশলী, এরাই হচ্ছে প্রধান। অস্থিরতা সব চেয়ে প্রবল ওদেরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের একেবারে শান্ত করা সম্ভব হোত যদি এদের তাপ তাপমানের শূন্য অঙ্কের নিচে আরো ২৭৩ ডিগ্রি, সেন্টিগ্রেড নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হোত।

এইবার হাইড্রোজেন-গ্যাসের পরমাণু-মহলে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

এর চেয়ে সাদাসিধে ব্যাপার আর নেই। এর পরমাণুর কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটি মাত্র বিদ্যুৎকণা যাকে বলে প্রোটন, আর তার চারদিকে ঘুরছে অন্য একটিমাত্র কণিকা যার নাম ইলেকট্রন। প্রোটিন পদার্থে যে বিদ্যুতের প্রভাব সে পজিটিভধর্মী, আর ইলেকট্রনের যে বিদ্যুতের ধরন সে নেগেটিভধর্মী। নেগেটিভ ইলেকট্রন ঘুরছে ঘিরে, পজিটিভ প্রোটন রাশভারি। ইলেকট্রনের চলনটা খেয়াল মাফিক নয়, পরমাণুর প্রাণ সম্বন্ধে ভার তার কেন্দ্রব্যূহের নির্দিষ্ট স্থান।

কোটের উপরে সব ইলেকট্রনই না-ধর্মী বটে কিন্তু এমন একজাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।

কখনো কখনো দেখা গেছে বিশেষ হাইড্রোজেন পরমাণু সাধারণের চেয়ে ওজনে ভারি। পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল, কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের সঙ্গে আছে তার এক সহযোগী। পূর্বেই বলেছি প্রোটন হাঁ-ধর্মী, তার কেন্দ্রের শরিকটিকে পরখ ক'রে দেখা গেল সে নারাধর্মী, হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়; অতএব সে বিদ্যুৎধর্মবর্জিত। সে আপন প্রোটন শরিকের সমান ওজনের, কিন্তু প্রোটন যেমন ক'রে ইলেকট্রনকে টানে এ তেমন টানতে পারে না, অথচ প্রোটনকে ছেড়ে ফেলবার চেষ্টাও তার নেই। এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে নুট্রন। এটি লক্ষ্য ক'রে দেখা গিয়েছে অন্য অনেক ভারি মাপের নিয়ে পরমাণু হচ্ছে ভারি করা থাকে ইলেকট্রনের উপরে সেই নারা-ধর্মীদের কোনো জোর খাটে না — একটি প্রোটন কেবল একটিমাত্র ইলেকট্রনকে সামলে রাখে। পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যে-পরিমাণে বেশি হয় সেই পরিমাণ ইলেকট্রনকে তারা বশে রাখে। অক্সিজেন-গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্রে আছে আটটি প্রোটন, সঙ্গে থাকে আটটি নুট্রন, তার প্রদক্ষিণকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা থাকে ঠিক আটটি।

পরিমিত জায়গাতে বহুপরিমাণ বিদ্যুৎ যেখানে সঞ্চিত হয়ে থাকে সেখানে যদি কোনো উপায়ে ছিদ্রবিস্ফোরণ ঘটানো যায়, প্রতিরক্ষক দেয়ালটিকে ভেঙে দেওয়া যায় তবে তাক ক'রে তাইতেই সেই জিনিসের বৈদ্যুতের পরিমাণের হিসাবে হবে

সরিয়ে, অতিরিক্ত হয়ে পড়লে পজিটিভ বিদ্যুতের চার্জ। মোটামুটিভাবে বলা চলে যেখানে প্রোটনদের সংখ্যায় সেখানে নেগেটিভ প্রভাবকে যে-পরিমাণে ছাড়িয়ে দেখা যাবে সে জায়গাটা সেই পরিমাণে হয়ে পড়বে পজিটিভধর্মী; এর উল্টোটাও তেমনি।

এই চার্জ কথাটি ইলেকট্রিসিটির প্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহার করি। সাধারণত এমন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করি যাদের মধ্যে বিদ্যুতের কোনো অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না, তারা চার্জ করা নয়, অর্থাৎ দুই জাতের যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ মিলেমিশে এক রকম শান্তি রক্ষা হয় তা তাদের মধ্যে আছে; কিন্তু তেমনি জিনিসে কোনো একটা জাতের বিদ্যুৎ যদি সঙ্গী না থেকে অপর বিশিষ্ট পরিমাণে ছাপিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকলে সেই বিদ্যুতের দ্বারা জিনিসটা চার্জ করা হয়েছে বলা হয়।

এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। ফল হোলো এই যে ঘষড়ানিতে কাঁচের থেকে কিছু ইলেকট্রন গেল বেরিয়ে, সেটা চালান গেল রেশমে। তাতে কাচেতেই পজিটিভ বিদ্যুতের প্রাধান্য ঘটলো, অন্যদিকে রেশমে নেগেটিভ বিদ্যুতের প্রভাব বাড়ল, সেটা হোলো নেগেটিভ বিদ্যুতের দ্বারা চার্জ করা। ইলেকট্রন-খোয়ানো কাচ তার পজিটিভ চার্জের জোরে টেনে নিতে চাইল রেশমটাকে,

আবার নেগেটিভের ভিড়-বাড়াবাড়ি; সেখানে টান পড়ল কাঁচের দিকে। কাচ বা রেশমে সাধারণতই যখন অক্ষুব্ধ ছিল তখন আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শান্ত। শান্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈদ্যুতের লক্ষণ জানাই যায়নি। বাইরে বৈদ্যুতিক গুণ দিকগুলোর পথ করলে বেরিয়ে পড়ল যেমনি ধাক্কাধাক্কির অসমানতায় ওদের কাঁপিয়ে দিলে।

কাচ কিংবা অন্য কিছুর থেকে ঘষাঘষির বলো সামান্য পরিমাণ ইলেকট্রন সরিয়ে নেবার কথা বলেছি। পরিমাণটা কত যদি বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি সামান্য একটু হিসেব করে বললেন, রগড়ানির মাত্রা অনুসারে তিরিশ পঞ্চাশ লক্ষ কোটি হতে পারে। বিজলি বাতির সরু-তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের দৌড়াদৌড়ি ভিড় চলতে থাকে অবিরত সে জানো। তারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যতগুলো ইলেকট্রন একসঙ্গে যাত্রা করে আমাদের গণিতশাস্ত্রে সেই সংখ্যার কী নাম আছে আমি তো জানিনে। মোটের উপর এটা দেখা গেল যে, অতিপরমাণুদের গুরুতর চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই টিকে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ঝুমঝুমি, তারি তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ঝুমঝুমিগুলো না যদি থাকে পোষমানা ভালুক যদি শিকলি কেটে খবর পায় তাহলে

কাঁপিয়ে দাপিয়ে চারদিকে অনর্গলভাবে ঘুরতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই ক্ষোভমানা ঝিকিমিকি নিয়ে অদৃশ্য কণাগুলির চলেছে ঘূর্ণি নাচ ও খেলা। প্রবীণ আইনস্টাইন দুই দশকের আগে কৌশল দিয়ে নিবিড় বিশ্বচরাচরের রহস্যভূমি সমন্বয় করে রেখেছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী পরমাণুজগৎকে সৌরজগতের সঙ্গে তুলনীয় বলে বলেছেন, পরমাণুর কেন্দ্র দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে যাচ্ছে ইলেকট্রনের দল। আবার কেউ প্রমাণ করলেন যে, বুর্কিশাকি-শাখার ইলেকট্রনেরা তাদের এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে লাফ দিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে নির্দিষ্ট পথে।

পরমাণুলোকের এই ছবি সৌরলোকের মতো, মাঝে আছে শক্তির উৎস একটি কেন্দ্রবস্তু, আর তার চারদিকে ইলেকট্রনদের প্রদক্ষিণ।

এ মত থেকে জানা যায় সাধা আছে। ইলেকট্রন যদি একটানা পথে চলতে থাকে ক্রমে তার শক্তি ক্ষয় হবে, শেষে পথ হারিয়ে সে পড়বে গিয়ে কেন্দ্রবস্তুর উপরে। পরমাণুর সর্বনাশ ঘটবে।

এখন এই মত দাঁড়িয়েছে, ইলেকট্রনের প্রদক্ষিণ চলবার পথ একটি নয়, একাধিক। কেন্দ্র থেকে এই কক্ষগুলির দূরত্ব নির্দিষ্ট। কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছের যে-পথ, কোনো ইলেকট্রন

তা পেরিয়ে যেতে পারে না। ইলেকট্রন বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন যে এমন হঠাৎ ঘটে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ করে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়, এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। তাড়া-খাওয়া এই ঢেউকেই আমরা পাই আলোরূপে। যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ইলেকট্রন তার শক্তি স্থিতিশীল রয়। এ যেন ঘরে-বেড়ানো একটা খেয়াল, কোনো কারণ দেখানো যায় না। শক্তি এসে নিজে ঝাঁপ দেওয়া যায়, পরমাণু কেন টিকে আছে, কেন ভেঙে বিগড়ে যায়নি।

এই সব কথার পিছনে দুরূহ তত্ত্ব আছে, সেটা বোঝবার অনেক দেরি। আপাতত কথাটা জেনে রাখা মাত্র।

পূর্বেই বলেছি বিজ্ঞানীরা খুব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ৯২টি আদিভূত নিরবচ্ছিন্ন মৌলিক পদার্থ। রেডিয়মগু-লোর সাক্ষ্য থেকে সে কথা অপ্রমাণ হয়ে গেল। তবু এখনো রয়ে গেল এদের সম্বন্ধে উপাধিটা।

একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের

নিশ্চিত আছে। তাদের একটি অন্যটা থেকে কিছুতেই তাদের স্বজাতির ভেদ হয় না। বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেল তাদের চরম ভাগ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই জাতীয় বৈদ্যুত-কণা, কণাস্বরূপ মুহূর্তে। যারা মৌলিক পদার্থ নামধারী তাদের স্বভাবের বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে এই সব বৈদ্যুতেরা বিশেষ সংখ্যায় একত্র হয়ে। এইখানেই যদি থামত তাহলেও পরমাণুদের রূপনিরূপণের কাজটা টিকে যেত। কিন্তু এদের ভিতরের দিকেই নিরুদ্ধ সংকেত পাওয়া গেল। একটা খবর পাওয়া গেল, যে, হালকা মৌলিক পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগাযোগ নিয়মনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটে আসছে বটে কিন্তু অত্যন্ত ভারি যারা, তাদের মধ্যে ইলেকট্রন-প্রোটন সংঘের অস্থিরতা দেখা দিল কিছু, যেমন ইউরেনিয়ম বা রেডিয়ম, তারা আপন ভাণ্ডার সামলাতে পারছে না, সর্বক্ষণই তাদের মাল নষ্ট ছিটকে পড়ছে বাইরে, তাতে তারা এক রূপ থেকে অন্য রূপ ধরছে।

একদা রেডিয়ম নামক এক মৌলিক ধাতু লুকিয়ে ছিল স্থূল আবরণের মধ্যে। তার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর গুপ্ত রহস্য ধরা পড়ে গেল। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবিলার ইতিহাস মনে রেখে দেবার যোগ্য।

যখন রাণ্টগেন রশ্মির আবিষ্কার হোলো, দেখা গেল তার স্থূল বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা। তখন হেনরি বেকেরেল

ছিলেন প্যারিস য়ুনিভর্সিটিতে ভূত বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আলো দীপ্তিমান পদার্থ মাত্রেরই এই বাধা ভেদ করবার শক্তি আছে কিনা সেই পরীক্ষায় তিনি লাগলেন। এইরকম কতকগুলি ধাতুপদার্থ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কালো কাগজে মুড়ে রেখে দিলেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপরে। দেখলেন তাতে মোড়ক ভেদ করে কেবল য়ুরেনিয়ম ধাতুরই চিহ্ন পড়ল। সকলের চেয়ে গুরুভার যার পরমাণু তার তেজস্ক্রিয়তা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

পিচব্লেণ্ড নামক এক খনিজ পদার্থ থেকে য়ুরেনিয়মকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। বেকরেলের এক প্রতিভাশালিনী বুদ্ধিমতী ছাত্রী ছিলেন মাডাম কুরি। তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি ফরাসী বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে এই পিচ্‌ব্লেণ্ড নিয়ে পরখ করতে লাগলেন, দেখলেন এর তেজস্ক্রিয় প্রভাব য়ুরেনিয়মের চেয়ে অনেক প্রবল। পিচব্লেণ্ডের মধ্যে এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে যারা এই শক্তির মূল, তারি আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনটি নূতন পদার্থ বের হোলো, রেডিয়ম, পোলোনিয়ম, এবং অ্যাক্টিনিয়ম।

পরীক্ষা করতে করতে প্রায় চল্লিশটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। প্রায় এদের সবগুলিই নিতান্ত নূতন জানা।

তারপরকার দিনে সকলের চেয়ে চমক লাগিয়ে দিল

এই ধাতুর একটি অদ্ভুত স্বভাব। সে নিজের মধ্যে থেকে জ্যোতিঃকণা বিকীর্ণ ক'রে নিজেকে নানা যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসে করে গেছে। এ যেন একটা বৈজ্ঞানিক ভেলকি বললেই হয়। এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর যে উদ্ভব হতে পারে, সে এই প্রথম জানা গেল :

যে সকল পদার্থ রেডিয়মের এক জাতের, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়াশীলই তাদের স্বভাব হল, সকলেরই ক্ষয়-পরিবর্তন ঘটে। তবে কোনটি সামান্য কালের মধ্যে রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই অপধাতুর মধ্যে প্রথম যে তেজ-পদার্থ পাওয়া, গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে আলফা। বাংলা বর্ণমালা হতে তাকে অ বলতে পারো। এ একটা পরমাণু, পজিটিভ চার্জের। রেডিয়মের আরো একটা জিনিস-কণা থেকে বেরিয়ে আসে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা, বলা যেতে পারে ব। সে ইলেকট্রন, নেগেটিভ চার্জ-কণা নিয়ত তার চিহ্ন নেই। তবু পাওয়া একটি আলফা চলার নাগাল পেলে আলফা-পরমাণু ইলেকট্রন লাভ করে, সে হয়ে যায় হিলিয়াম-গ্যাস। আরো কিছু বাকি আছে বীটাকে পরিচয় দিতে। রেডিয়মের ভিতর এই দুটি ছাড়া আর একটি রশ্মি আছে তার নাম গামা : সে পরমাণু বা শক্তিপরমাণু নয়, সে একটি বিশেষ আলোকরশ্মি। তার কিরণ খুব বহুদূরে

ভেদ করে যেতে পারে, যেমন গামা রশ্মি। এই সব তেজকণার ব্যবহার সকল অবস্থাতেই সমান, লোহা গলানো আগুনেও, গ্যাস-জমানো ঠাণ্ডাতেও। তা ছাড়া তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আবার পূর্বের মতো বাসা বেঁধে দেওয়া কারো সাধ্য নেই।

পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুটিতে যতক্ষণ না কোনো লোকসান ঘটে ততক্ষণ ছুটো-ছাটা ইলেকট্রন যদি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তার স্বভাবের বাঁধা ধাতে কিছু ক্ষতি পড়তে পারে কিন্তু সম্পূর্ণতই পরিবর্তিত হয় না। যদি ঐ কেন্দ্রবস্তুটার ধাম্ সরিয়ে দিলে দুর্গপাতি সম্ভব হয় তাহলেই পরমাণুর জাত বদল হয়ে যায়।

পরমাণুর নিজের মধ্যে একান্ত ঐক্য নেই এ কথাটা সেইই বিজ্ঞানীরা প্রথমটা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা ভেঙে-চুরে-মারা গোলন্দাজ ইলেকট্রনকে লাগাবেন পরমাণুর মধ্যে ঢুকে ঘটিয়ে তার কেন্দ্র-সম্পদটার দুর্গপ্রাচীর ভাঙবে। কিন্তু ক্ষমতাটি অকিঞ্চিৎকর, নিশানা করা সহজ নয়, দেয়ালে ঠেকে, বিরুদ্ধ মারের মারতে ঠিকায় একটা গোলা হারে। তাই এরকম অনিশ্চিত লড়াই-প্রণালীর বদলে অন্যরকম প্রকাণ্ড যন্ত্র তৈরির আয়োজন হচ্ছে যাতে অতি প্রচণ্ড শক্তিমান বৈদ্যুত উৎপন্ন হবে পরমাণুর কেন্দ্রস্তূপের পাহারা ভেদ করতে পারে। সেখানে আছে প্রবল পালোয়ান শক্তির পাহারা। আজ ঠিক সে-সময়টাতে লাখ লাখ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রঘ্নী যন্ত্রের

বিজ্ঞানের যুদ্ধে ঠিক সেই সময়টাতেই বিশেষ সূক্ষ্মভাবে পদার্থের অন্তঃকরণের মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্যে বিরাট বৈদ্যুত-বর্ষীর কামানগুলো বসল!

পূর্বেই বলেছি তেজস্ক্রিয় ধাতু ক্ষয় পেতে পেতে হয়ে যায় হেলিয়ম গ্যাস। এটা থেকে জেনেছি পৃথিবীর বয়স আন্দাজ করতে। কোনো পাহাড়ের একখানা পাথরের মধ্যে যদি বিশেষ পরিমাণে হেলিয়ম গ্যাস দেখা যায়, তাহলে এই গ্যাসের পরিণতির নির্দিষ্ট সময় হিসাব করে ঐ পাহাড়ের বয়স ঠিক করা যায়। এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বয়স বিচার করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মিজ্যোতিষ্মান-ধাতুর ঠিক উপরের কোঠাতেই পড়ে যে গ্যাস তারই নাম দেওয়া হয়েছে হেলিয়ম। এই গ্যাস নিষ্ক্রিয়দলের সবচেয়ে হালকা। এই গ্যাস প্রথম ধরা পড়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়ে। সূর্য, অর্থাৎ ক্ষত্রীয়াষ্ট্রিক ঢাকা পড়লে যখন চাঁদ ঢেকে দেয় তখন সূর্যমণ্ডলের উজ্জ্বলতা উঠে থাকে; যখন সেখানে অন্ধকার ঘনায় হঠাৎ আকাশের চারদিকে ধরা পড়ে সেই রঙিন চারদিকের আলোর গ্যাসের বিচার দেখতে পাওয়া যায় দূরবীনে। এই দুরবিনযোগে গ্যাসের দীপ্তিকে গ্রীকভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।

কিছুকাল আগে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সুযোগে এই

সৌরটিকা পরীক্ষা করবার সময় বর্ণলিপির নীলসীমানার দিকে দেখা গেল একটা অজানা সাদা রেখা। পণ্ডিতেরা ভাবলেন হয়তো কোনো একটি জানাশোনা পদার্থ অধিক দহনে নূতন দশা পেয়েছে, এটা তারই চিহ্ন। কিংবা হয়তো একটা নতুন পদার্থই এর কারণ নিশ্চয়। এখনো তার ঠিকানা মেলেনি।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীদের এই নজরই একটা চমক লাগিয়েছিল। সূর্যের প্রান্তীয় দেহের ভিতর থেকে একটা বিশেষ রেখা উকি মারছিল, পণ্ডিতেরা এই নূতন-দেখা-পাওয়া মৌলিক পদার্থের নাম দিয়েছেন হেলিয়ম, অর্থাৎ সৌরক। কেননা তখন মনে হয়েছিল এটা কেবলমাত্র সূর্যেরই সম্পত্তি। অবশেষে ত্রিশ বছর কেটে যাবার পর বিখ্যাত রসায়নী র‍্যামজে এই গ্যাসের আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর হাওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণে। এখন কিন্তু হেলিয়ম পৃথিবীতে এ গ্যাস দুর্লভ। তার পরে দেখা গেল উত্তর-আমেরিকায় কোনো কোনো তেলের খনিতে যে গ্যাস পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণে হেলিয়ম আছে। তখন থেকে তাকে পাওয়ার সুবিধে হোলো। আকাশে হালকা গ্যাসে এতদিন হাইড্রোজেন-গ্যাস দিয়ে আকাশযানগুলোর উড়োন-শক্তির জোগান দেওয়া হোত। কিন্তু হাইড্রোজেন-গ্যাস ওড়াবার পক্ষে যেমন জোরালো, জ্বালাবার পক্ষে তার চেয়ে কম না। এই গ্যাস অনেক সময় মস্ত উড়ো জাহাজকে জ্বালিয়ে

গেছেন। হেলিয়ম-গ্যাসের মধ্যে প্রথম দুটো ফোটন-কণা নেই, অথচ হাইড্রোজেন ছাড়া সকল গ্যাসের ভেতর এ হালকা। এই অদৃশ্য শুভ্রালোকে নিরীক্ষণ করবার জন্যে তাঁরা ব্যবহার করতে হয়েছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে কোনো কোনো রোগে এর প্রয়োগ শুরু হোলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে পজিটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ ও নেগেটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ পরস্পরকে কাছে টানে কিন্তু একই জাতীয় চার্জওয়ালা পরস্পরকে ঠেলে ফেলতে চায়। যতই তাদের কাছাকাছি এরা আসে ততই তীব্র হয় এই তাদের ঠেলার জোর! কেননা বিপরীত চার্জওয়ালা বলেই পরস্পরের কাছে আসে তাদের টানের জোর ততই বেড়ে ওঠে। এই জন্যে যেমন ইলেকট্রন কেন্দ্রবস্তুর কাছাকাছি থাকে তারা টানের জোর এড়াবার জন্যে দূরবর্তীদের চেয়ে দৌড়ন বেশি করে। সৌরমণ্ডলে যেমন গ্রহ সূর্যের যত কাছে তাদের দৌড়ের বেগ ততই বেশি। দূরের গ্রহদের বিশেষ কম, তারা অনেকটা ধীরে সুস্থে চলে:

এই ইলেকট্রন প্রোটনের বাদে সমস্ত পরমাণুর পদার্থের হাজার ভাগের একভাগ। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রটাই বেশি। একটা মানুষের দেহের সমস্ত পরমাণু যদি ঠেসে দেওয়া যায়, তাহলে তার থেকে একটি অদৃশ্যপ্রায় বস্তুবিন্দু তৈরি হবে।

দুই প্রোটনের পরস্পরের প্রতি বিদ্যুৎতাড়নার জোর যে কত, রসায়নী বৈজ্ঞানিক সডি তার হিসাব ক'রে বলেছেন এক গ্রাম পরিমাণ প্রোটন যদি ভূতলের এক মেরুতে রাখা যায় আর তারি বিপরীত মেরুতে থাকে আর এক গ্রাম প্রোটন তাহলে এই সুদূর পথ পেরিয়ে গিয়ে তাদের উভয়েরই ঠেলা মারার জোর হবে প্রায় ছ-শো টনের চাপ। এই যদি বিধি হয় তাহলে কোন্ শক্তি হয় পরমাণুকেন্দ্রের অতিসংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে একটির বেশি প্রোটন কেমন করে ঘেঁষাঘেঁষি মিলে থাকতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে হাইড্রোজেন, যার পরমাণুকেন্দ্রে একটিমাত্র প্রোটনের অধিকার, সে ছাড়া বিশ্বে আর কোনো পদার্থ তো টিঁকতেই পারে না; তাহলে তো বিশ্বজগৎ হয়ে উঠত হাইড্রোজেনময়।

ওদিকে দেখো, যায় যুরেনিয়ম ধাতু বহন করেছে ৯২টা প্রোটন, ১৪৬টা ন্যুট্রন। এত বেশি কিছু সে সামলাতে পারে না একথা সত্য, তাকে দেখি সে তার কেন্দ্রভাণ্ডার থেকে বিদ্যুৎকণার বোঝা খালাস করতে থাকে। তার কিছু পরিমাণ কমলে সে রূপ নেয় রেডিয়মের, আরো কমলে হয় পোলোনিয়ম, অবশেষে সীসের রূপ ধরে স্থিতি পায়।

ওজন এত বেশি হলেও স্থিতি পায় কী করে এ সন্দেহ তো দূর হয় না। বিকিরণের পালা শেষ করে সমস্ত খালাস নিয়েও সীসের দখলে বাকি থাকে ৮২টা প্রোটন। পজিটিভ

নিউক্লিয়াসের ঘনত্বে ঠাসা থাকে, যেখানে নিয়ে এই প্রোটনগুলো পরমাণুলোকের শান্তিরক্ষা করে কী করে, নির্ভরযোগ্য বহুদিন এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না। কেন্দ্রের নিউট্রনগুলোর ধাক্কা খেয়ে না, কেন্দ্রের বিকর্ষণের এতসব ঠেলা! মুক্তি, এ একটা বিষম সমস্যা।

এই রহস্যভেদের উপযোগী করে যন্ত্রশক্তির বল বৃদ্ধি করা হোলো : পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটিন-কণার বিরুদ্ধে পরীক্ষকেরা দু-একটি উত্তেজকণার দল লাগিয়ে দিলেন ; যন্ত্র জোরের উত্তেজকণা তাদের ধাক্কা দিল যার বেগ সেকেণ্ডে ৬৭২০ মাইল। তবু কেন্দ্রস্থিত প্রোটন আপন প্রাতিকূল্য রক্ষা করলে, আক্রমণকারী উত্তেজকের দলকে ছিটকিয়ে ফেললে। উত্তেজিত কণিকার জোর বাড়িয়ে দেওয়া হোলো। বিজ্ঞানী, লাগালেন ধাক্কা ৭০০০ মাইলের বেগে, কিন্তু বাধাটিকে তার মানাতে পারলেন না। অবশেষে ৮২০০ মাইলের ধাক্কা তেমন বিরুদ্ধ শক্তি নরম হবার লক্ষণ দেখালে। ছিটকোনো-শক্তির বেড়া ডিঙিয়ে আক্রমণশক্তি পৌঁছল কেন্দ্রদুর্গের মধ্যে। দেখা গেল দুটি সমধর্মী উত্তেজকণা যত কাছে গিয়ে পৌঁছলো তাদের ঠেলাঠেলি হয়ে উঠে সে তফাৎ এক ইঞ্চির বহু কোটি ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ নিকটতার মধ্যে প্রোটিনদের পরস্পর ঠেলা ফেলার শক্তি যত তার চেয়ে প্রচুর বড়ো একটা শক্তি আছে, টেনে রাখবার শক্তি। ঐ শক্তি

পরমাণুমণ্ডলে প্রোটনকেন্দ্র যেমন টানে ইলেকট্রনও তেমনি টানে, অর্থাৎ বৈদ্যুতের চার্জ যার আছে তার মান নেই উভয়েরই পাল্লাই তার সমান প্রভাব। পরমাণুকেন্দ্রগামী এই অতি প্রবল আকর্ষণশক্তি সমস্ত বিশ্বকে রেখেছে বেঁধে। পরমাণুর মধ্যেকার যথোচিত বিভাগ নিয়ন্ত্রিত যে শাসন, সেই শাসনেই বিশ্বে বিধৃত করে রাখছে।

আধুনিক ইতিহাস থেকে এর উপমা সংগ্রহ ক'রে দেখা যাক। চীন দেশবিদেশের শক্তি নষ্ট ক'রে কতকগুলি আধিপত্যলোলুপ জেনারেল পরস্পর লড়াই ক'রে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধদলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তাহলে শাসনের তাড়া এদের সকলকে এক ক'রে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ ক'রে রাখা সহজ হোত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির উপরে, সেই রাজা অপরাজিত থেকে না তারাও মিলে বিশ্বের শান্তি রক্ষা করছে। এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পরস্পরাগত জোড়াতাড়ির শান্তি নয়। যত সব দুরন্তদের নির্বিশেষে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে, যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।

পরমাণুর ইতিহাসে প্রোটনের অধ্যায়ের মূল্য বেশি— সেইজন্যে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই।—

রেডিয়ম থোরিয়ম প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদের পরমাণুগুলি ভারী এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার থেকে একটু অংশ যায় ছুটে; এই আলফা-কণা পরমাণু থেকে নিক্ষিপ্ত আলফা-রশ্মিতে যে-কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হিলিয়ম-পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুই সেই তারা। এবং বীটা-রশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা। গামা-রশ্মিতে কণা নেই। তা আলোকজাতীয়। কেন যে এমন ভাঙচুর হয় তার কারণ আজও ধরা পড়েনি। এইটুকু অপঘাতের দরুন পরমাণুর বাকি অংশ আর সেই সাবেক রেডিয়ম-রূপে থাকে না। তার স্বভাব যায় বদলিয়ে। দুটি ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে আলফা-কণার পরিণতি ঘটে হিলিয়ম-গ্যাসে। এই ভাঙন আপনা থেকেই ঘটে, বাইরের কিছুতে না পারে উসকিয়ে দিতে, না পারে থামাতে। তাদের নিজের অবস্থা ঠাণ্ডাই থাক্‌ আর গরমই থাক্‌, অন্য পরমাণুদের সঙ্গে মেশামেশিই করুক্‌, অর্থাৎ তার বাইরের ব্যবস্থা যে রকমই হোক তার ছোটো হওয়ার কাজটা ঘটতে থাকে ভিতরের থেকে। গড়ের উপরে রেডিয়মের আয়ু প্রায় দু-হাজার বছর, কিন্তু তার যে পরমাণু থেকে একটা আলফা-কণা ছুটে গিয়ে রেডন হয়েছে তার মেয়াদ প্রায় দিন চারেকের। তার পরে তার থেকে পরে পরে

উৎপাত ঘটিয়ে থাকে, অবশেষে গিয়ে ঠেকে পড়েছে। আল্‌ফা-কণা যখন শুরু করে তার দৌড় তখন তার বেগ থাকে এক সেকেণ্ডে প্রায় দশহাজার মাইল। কিন্তু যখন তাকে কোনো বস্তুপদার্থের, এমন কি বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তখন দু-তিন ইঞ্চি পর্যন্ত পথ যেতে যেতেই তার চলন মন্দ হয়ে আসে। আলফা-রশ্মি চলে একেবারে সোজা রেখা ধরে। কী করে পারে সে একটা ভাববার কথা। কেননা বাতাসের যে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন পরমাণু আছে হিলিয়মের পরমাণু তার চেয়ে অনেক হালকা আর ছোটো। এই তিন ইঞ্চি রাস্তায় বাতাসের ভিতর লাখ লাখ অণু তাদের ঠেলে যেতে হয়। এ কিন্তু ভিড় ঠেলে যাওয়া নয়, ভিড় ভেদ করে যাওয়া। পরমাণু বলতে বোঝায় একটি কেন্দ্রবস্তু আর তাকে ঘিরে দৌড়-খাওয়া ইলেকট্রনের দল। এদের পাহারার ভিতর দিয়ে ঢুকে প্রবেশ করবার জোর নেই। সেই জোর আছে আলফা-কণার। সে এক একটার ভিতর দিয়ে চলে যায়। অন্য পরমাণুর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে লোকসান ঘটাতে থাকে। কোনো পরমাণুর থেকে হয়তো একটা ইলেকট্রন সরিয়ে, ক্রমে দুটো তিনটে দেয় খসিয়ে। তার ফলে, তখন ইলেকট্রনগুলো বাঁধনছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অন্য পরমাণুর সঙ্গে জোড় বাঁধে। যে পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়েছে তাকে বলে পজিটিভ হয়েছে।

চার্জ আর যে পরমাণু ছাড়া ইলেকট্রনটাকে ধরবার জন্যে তাই অর্জ থেকেই ছেড়েছে। তারা যদি পরস্পরের খুবই কাছাকাছি আসে তাহলে আবার নিজের সমান হতে দেয়। আলফা-কণা এখন হেলিয়ামের আকারে শান্ত হয়ে যায়। সাধারণত হেলিয়াম-পরমাণুর থাকে দুটো ইলেকট্রন। কিন্তু রেডিয়ম থেকে আলফা-কণিকারূপে নিঃসৃত হয়ে সে যখন অন্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকে তখনকার মতো তার সঙ্গী দুটো থাকে ছিন্ন হয়ে। অবশেষে উপযুক্ত অন্য কোনো দুটি ইলেকট্রনদের মধ্য থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসে।

এইখানে আর একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করে দেওয়া যাক। সকল বস্তুরই পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটন ও ন্যূট্রন একই পদার্থ। ওদেরই সংখ্যাভেদ নিয়ে বস্তুর ভেদ। যে পরমাণুর আছে ছোটো ছয়টা পজিটিভ চার্জ সেই হোলো কার্বনের অর্থাৎ অঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু। সাতটা ইলেকট্রনওয়ালা পরমাণু নাইট্রোজেনের, আটটা অক্সিজেনের। কেবল হাইড্রোজেন পরমাণুর আছে একটি ইলেকট্রন। আর বিরানব্বইটি আছে ইউরেনিয়মের। পরমাণুদের মধ্যে পজিটিভ চার্জের সংখ্যা ভেদ নিয়েই তাদের স্বাতন্ত্র্য। সৃষ্টির সমস্ত বৈচিত্র্য এই সংখ্যার ছন্দে।

বৈজ্ঞানসন্ধানীরা যখন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন তখন তাদের হিসাবে গোলমাল বাধিয়ে দিলে অকস্মাৎ একটা

অজানা শক্তির অস্তিত্ব ধরা দিল। তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি, কস্মিক রশ্মি। বলা যেতে পারে আকাশিক রশ্মি। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না কিন্তু দেখা গেল সর্বত্রই। কোনো বস্তু বা কোনো জীব নেই যার উপরে এর কশাঘাত চলছে না। এমন কি বায়ুস্তরের পরমাণুগুলোকে ঘা মেরে বৈদ্যুতিক করে দিচ্ছে। হয়তো এরা জীবের প্রাণশক্তির সাহায্য করছে কিংবা বিনাশ করছে, কী করছে জানা নেই, আমার কাছে এইটুকুই নিশ্চয়।

এই যে ক্রমাগতই কসমিক রশ্মি বর্ষণ চলেছে এর উৎপত্তির রহস্য অজানা রয়ে গেল। কিন্তু জানা গেছে বিপুল এর উদ্যম, সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত এবং সঞ্চরণ, জলে স্থলে একাকার সকল পদার্থেই এর প্রবেশ। এই নয়, আণবিকের পিছনে বিজ্ঞানের চর লেগেই আছে, কোনোদিন এর গোপন ঠিকানা ধরা পড়বে।

অনেকে বলেন কস্মিক আসলে আলোই বটে, রন্টগেন রশ্মির চেয়ে বহুগুণ জোরালো। তাই এরা সহজে পুরু সীসে বা লোহা সোনার পাত পার হয়ে চলে যায়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটুকু জানা গেছে এই আলোর সঙ্গে আছে বৈদ্যুত কণা। পৃথিবীর যে ক্ষেত্রে চৌম্বকশক্তি বেশি এরা তারি টানে আপন পথ থেকে সরে গিয়ে মেরুপ্রদেশে

জমা হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কসমিক রশ্মির সমাবেশের কমবেশি দেখা যায়।

কসমিক রশ্মির সম্বন্ধে এখনো নানাবিধের আলোচনা চলেছে। পরমাণুর নূতন তত্ত্বের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞান-মহলে মনোযোগ ও মতের কোলাহলের অন্ত নেই, বিশ্বের ঐ কারখানার ব্যবস্থা জানবার পাকা সংকেত খুঁজে দেবার কথা অসাধ্য হোলো। নিত্য বংশে যদি কিছু থাকি শেষে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের মান! অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

নক্ষত্রলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক; এদের সম্মিলনের দ্বারা রূপবান বস্তুলোক অভ্যুদয়।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বপদার্থের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে, তা ছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষরূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরো সূক্ষ্ম বা আরো স্থূল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। সেখানটা নিতান্ত অল্প, না-দেখারটাই অত্যন্ত বেশি। জীবিকার শক্তি চালাতে গেলেই সেই অনুগামী আমাদের চোখ কান, আমরা যে বিজ্ঞানী, হব প্রকৃতি সে খেয়ালই করেনি। মানুষের চোখ অণুবীক্ষণ ও দূরবীন এই দুইএর কাজই সামান্য পরিমাণে করে থাকে। বোধের সীমা বাড়ল বা বোধের প্রকৃতি গেল বদলে তখন আমাদের জগৎটাও হোত অন্যরকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্য রকমই তো হয়েছে। একটি অসম্ভবের দেশ, যে আলোয় আমরা কাজ চালাই এ প্রকাশের পরিচয়ে তার অপ্রকাশিতই থেকে যায় না। প্রত্যহ এমন

নিক্ষেপযান তাহা তৈরি করতে হবে যে, পৃথিবীর মাটির টান তার গতিবিধি রুখতে পারবে না।

একদিন মানুষ ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যনক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সেজন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে। আজ তার চোখ বেড়ে গেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। এরা নিজে জেনেছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয়, সূর্যের চারদিকে, প্রদক্ষিণ করতে মস্ত পাক নিয়ে নিয়ে। পথ সুদীর্ঘ, লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। এর চেয়ে বড়ো পাকওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে অতদিন বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের পরমায়ু ঢের বাড়াতে হবে।

রাত্রের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হালকা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দূরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-জগৎ নিয়ে এই লোকালোক নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত বেগে তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন? উত্তর দিতে গিয়ে বৈজ্ঞা

হোলো। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। পরস্পরের থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে এরা চলাফেরা করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে স্যর জেম্স্ জীন্স্ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেম্স্ জীন্স্ বলেন সেই স্টেশন থেকে আর সব খালি করে ফেলে কেবল ছটি মাত্র ধূলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হোতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হোতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ করবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই যে ক্রমে ক্রমে তাপ ছড়াতে থাকে। উত্তপ্ত জল থেকে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হোতে হোতে সেই বাষ্প জমে হয় জলের কণা। তেমনি তাপ দিলে কঠিন পদার্থও গলে যায় তরল হয়ে; সেইরকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারি সব

জিনিসই ছিল গ্যাস। কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হচ্ছে; তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোটো ছোটো টুকরো ঘন হয়ে জমাট পাকাচ্ছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলছে। য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা, বহুবচনে নেব্যুলে। আমাদের সূর্য আছে এই রকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে।

আমেরিকার পর্বতচূড়ায় মানমন্দিরে রয়েছে মস্ত বড়ো এক দূরবীন, তার ভিতর দিয়ে খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যানড্রোমিডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো। সেই চাকা ঘুরছে। একপাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় দুকোটি বছর। নয় লাখ বছর আগে ওর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁচেছে।

আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শি বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যা-বাঁধা যে পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে স্টিমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র জগতের সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ

বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্রে নাক্ষত্রিক হিসাবটার উপর দিয়ে সংখ্যার যে চিহ্ন দৌড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপদ কীটেরই নকলে।

সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসাবে, নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করলে সেটা অঙ্কের বোঝা ভারী হয়ে উঠবে। পৃথিবী তো আমাদের পায়ে থেকে যথেষ্ট দূরে, তার চেয়ে বহু লক্ষগুণ দূরে আছে নক্ষত্রের দল, মাইল দিয়ে তাদের দূরত্ব গোনা কড়ি দিয়ে হাজার হাজার মোহর গোনার মতো। সংখ্যা-সংকেত বানিয়ে মানুষ কাগজের বোঝা হালকা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের মাপে এ সংকেতেও কুলোল না। তাই আর এক সংকেত বেরিয়েছে। তাকে বলা যায় আলো-চলার মাপ। ৩৬৫ দিনের বছর হিসাবে সে চলে পাঁচ লক্ষ অষ্টাশি হাজার কোটি মাইল। সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে, তেমনি নক্ষত্রদের পরিধি, তাদের সীমাসরহদ্দের মাপ, আলো-চলা বছরের মাত্রা গণনা করে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের পরিধি আন্দাজ একলক্ষ আলো-বছরের মাপে। আরো অনেক লক্ষ নাক্ষত্র-জগৎ আছে এর বাইরে। সেই সব ভিন্ন পাড়ার নক্ষত্রদের মধ্যে একটির পরিচয় জ্যোতিষীকে জানা হয়েছে, হিসেবমতে সে প্রায় পঁচাশিলক্ষ আলো-বছর দূরে। আমাদের নিকটতম

প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। এর থেকে বোঝা যাবে কী বিপুল শূন্যতার মধ্যে বিশ্ব ভাসছে। এইজন্যেই অনেকে বলেন পৃথিবীতে স্থানাভাব নিয়েই লড়াই বাধে। নক্ষত্রদের মাঝখানে কিছুমাত্র যদি জায়গার টানাটানি থাকত তাহলে সর্বনাশে ঠোকাঠুকিতে দিয়ে যেত চুরমার হয়ে।

চোখে দেখার যুগ থেকে এল দূরবীনের যুগ। দূরবীনের জোর বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল দ্যুলোকে আমাদের দৃষ্টির পরিধি। পূর্বে যেখানে ফাঁক দেখেছি সেখানে দেখা দিল নক্ষত্রের ভিড়। তবু বাকি রইল অনেক। বাকি থাকবারই কথা। আমাদের নাক্ষত্রজগতের বাইরে এমন সব জগৎ আছে যাদের আলো দূরবীন দৃষ্টিরও অতীত। একটি বাতির শিখা ৮৫৭৫ মাইল দূরে থেকে যে দীপ্তি দেয় এমনতরো আলোকে দূরবীন চোখে ধরবার চেষ্টা হয়, হার মানে মানুষের চক্ষু। দূরবীন আপন শক্তি অনুসারে খবর এনে দেয় চোখে, চোখের যদি শক্তি না থাকে সেই প্রতিবিম্ব খবরটুকু বোধের কোঠায় চালান করে দিতে, তাহলে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফ ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী। সেই শক্তির উদ্বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরবীন আকাশের আলো ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটোগ্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখঢাকা

আলোর উপর সহজে জারি করতে পারে। দূরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরো বিচিত্র ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে নানা পদার্থ গ্যাস হয়ে জ্বলছে। তারা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন দেখা দেয় তখন এদের তফাত ক'রে দেখা সম্ভব হয় না। সেইজন্যে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী সূর্য-দেখা দূরবীন বানিয়েছেন যাতে জ্বলন্ত গ্যাসের সবরকম রং থেকে এক-একটি রঙের আলো ছাড়িয়ে নিয়ে তার সাহায্যে সূর্যের সেই বিশেষ গ্যাসীয় রূপ দেখা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছামতো কেবলমাত্র জ্বলন্ত ক্যালসিয়মের রং কিংবা জ্বলন্ত হাইড্রোজেনের রঙে সূর্যকে দেখতে পেলে, তার গ্যাসীয় অগ্নি-কাণ্ডের অনেক খবর মেলে যা আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না।

সাদা আলো ভাগ করতে পারলে তার বর্ণসপ্তকের এক-দিকে পাওয়া যায় লাল অন্যদিকে বেগনি— এই দুই সীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে আলো সে আমাদের চোখে পড়ে না।

নীল বেগনির অংশের ঢেউয়ের পরিমাপ এক ইঞ্চির দেড়কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এই আলোর রঙে যে ঢেউ খেলে তার একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে পরবর্তী ঢেউয়ের চূড়ার মাপ এই। এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে দেড়কোটি ঢেউ। লাল রঙের আলোর ঢেউ প্রায় এর দ্বিগুণ লম্বা। একটা তপ্ত

রোহিণীর দৃশ্য লাল আলো যখন ক্রমেই নিভে আসে, তার দেখা যায় না, তখনও আরো বড়ো মাপের অদৃশ্য আলো তার থেকে ঢেউ দিয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিকে সে যদি বাড়িয়ে তুলতে পারত তাহলে সেই লাল-উজানি ঢেউয়ের আলোয় আমরা নিভে-আসা লোহিতকে দেখতে পেতুম, তাহলে যদিও তাদের নক্ষত্রলোকের অন্ধকারে চোখ মিলিয়ে গেলেও লাল উজানি আলোয় জীবন্ত পৃথিবী আমাদেরও কাছে প্রকাশিত হয়ে দেখা দিত।

একেবারে অন্ধকার বলে কিছুই নেই। যাদের আমরা দেখতে পাইনে তাদেরও আলো আছে। নক্ষত্রলোকের বাইরের নিবিড় কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এই সকল অদৃশ্য দূতকেও দৃষ্টিপথে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অস্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত নবীন ফোটোগ্রাফের সাহায্যে।

বেগনি-পারের আলো জ্যোতিষীদের কাছে লাল-উজানি আলোর মতো এত বেশি কাজে লাগে না। তার কারণ এই খাটো ঢেউয়ের আলোর অনেকখানি পৃথিবীর হাওয়া পেরিয়ে আসতে নষ্ট হয়, দূরলোকের খবর দেবার কাজে লাগে না। এরা খবর দেয় পরমাণুলোকের। একটা বিশেষ পরিমাণ উত্তেজনায় পরমাণু নানা আলোয় স্পন্দিত হয়। তেজ আরো বাড়লে দেখা দেয় বেগনি-পারের আলো। অবশেষে পরমাণুর

কোনোবস্তু মধ্যে বিচলিত তেজ থাকে তখন সেই স্পন্দন উত্তেজনায় দেখা দেয় আরো খাটো ঢেউ যাদের বলি গামা-রশ্মি ; মানুষ তার যন্ত্রের শক্তি এতদূর বাড়িয়ে তুলেছে যে এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির মতো রশ্মিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম সে হচ্ছে এই যে, বর্ণলিপি বাঁধা দূরবীন ফোটোগ্রাফ নিয়ে মানুষ নাক্ষত্রবিশ্বের অতিদূর অদৃশ্য লোককে দৃষ্টিপথে এনেছে। আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকের সুদূর বাইরে আরো অনেক নাক্ষত্রলোকের ঠিকানা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, নক্ষত্রেরা যে সবাই মিলে আমাদের নাক্ষত্র আকাশে এবং বৃহত্তর আকাশে খুব বেগে ছুটে চলছে ধরা পড়েছে এই সহজ বুদ্ধিতে।

দূর আকাশের কোনো জ্যোতিষ্ময় পদার্থপিণ্ড, যাক বলো নক্ষত্র, যখন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিংবা পিছিয়ে যায় তখন আমাদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্যের আলোর ঢেউ আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছিয়ে দিত সামনে কাছে এলে তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মায়, দূরে গেলে তার চেয়ে বেশি। যেসব আলোর ঢেউ দৈর্ঘ্যে কম, তাদের রং ঘেঁষে বর্ণমণ্ডলের বেগনির দিকে, যার বেলা দৈর্ঘ্য বেশি তারা পৌঁছয় লাল রঙের কিনারায়। এই কারণে নক্ষত্রের কাছে-

আলো দূরে-যাওয়ার সংকেত চিহ্ন হচ্ছে সিগন্যালে জানিয়ে দেয় বর্ণালি। হুইসল বাজিয়ে রেলগাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় তাদের তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে চড়া ঠেকে। কেননা শব্দধ্বনি বাতাসে যে ঢেউ তোলে আওয়াজ আমাদের কানের কাছাকাছি, গাড়ি কাছে এলে সেই ঢেউগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে কানে চড়া সুরের অনুভূতি জাগায়। আলোতেও চড়া হচ্ছে নীল বেগুনির দিক।

কোনো কোনো গ্যাসীয় নীহারিকার যে উজ্জ্বলতা সে তার আপন আলোকে নয়। যে নক্ষত্রগুলি তাদের মধ্যে ডুবে আছে তারাই ওদের আলোকিত করছে। আবার কোথাও নীহারিকার পরমাণুগুলি নক্ষত্রের আলোককে নিজেরা শুষে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোরূপে তাকে চালান করে।

নীহারিকার আর একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে কালো কালো রেখা আছে, নিবিড়তম তারার ভিড়ের মধ্যে এক-এক জায়গায় কালো ফাঁক। জ্যোতিষী বার্নার্ডের পর্যবেক্ষণে এমনতরো প্রায় ছত্রিশটি কালো আকাশখণ্ডের দেখা মিলেছে। বার্নার্ড অনুমান করেন এগুলি অস্বচ্ছ গ্যাসের মেঘ, এর পিছনের তারাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাছে, কোনোটা দূরে, কোনোটা ছোটো, কোনোটা প্রকাণ্ড বড়ো।

নক্ষত্রলোকের অন্তর্বর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায় যে সে অত্যন্ত কম, প্রত্যেক ঘন ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু। সে যে কত কম এই বিচার করলে বোঝা যাবে যে বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে সবচেয়ে জোরের পাম্প দিয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও ঘন ইঞ্চিতে বহু কোটি পরমাণু বাকি থেকে যায়।

আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকটি প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ, বহু শত কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ। তাদের মধ্যে মধ্যে যে আকাশ তাতে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস কোথাও বা অত্যন্ত বিরল, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও বা অস্বচ্ছ। সূর্য আছে এই নাক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দূরে একটা নাক্ষত্রমেঘের মধ্যে। নক্ষত্রগুলির বেশি ভিড় নীহারিকার কেন্দ্রের কাছে।

অ্যান্টারেস নক্ষত্রের ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল, আর সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। সূর্য মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্রজগতের একটি মধ্য-বিত্ত তারা এই সূর্য, তার মতো এমন আরো আছে লক্ষ লক্ষ জগৎ। সব নিয়ে এই যে ব্রহ্মাণ্ড, কোথায় তার সীমা তা আমরা জানিনে।

আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে আর

তার সঙ্গেই ঘুরছে এই নাক্ষত্র চক্রবর্তীর দল তারাই, একটি কেন্দ্রের চারদিকে। এই স্থলে সূর্যের ঘূর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতোই সে বেগের ঝোঁকে নক্ষত্রচক্র থেকে ছিটকে পড়ত; এই চক্রের প্রকাণ্ড কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।

এই টানের শক্তির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা তবু সেটা এই বিবরণী থেকে বাদ দিলে চলবে না।

সত্য হোক মিথ্যা হোক একটা গল্প চলিত আছে যে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নিউটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল, তখনি তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নিচেই বা পড়ে কেন উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। তাঁর মনে আরো অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল — ভাবছিলেন চাঁদ কিসের টানে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীই বা কিসের টানে ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। ফল পড়ার ব্যাপারে তিনি বুঝলেন একটা টান দেবার শক্তি আছে এই পৃথিবীর। সব-কিছুকে সে নিজের ভিতরের দিকে টানছে। তাই যদি হবে তবে চাঁদকেই বা সে ছাড়বে কেন। নিশ্চয়ই এই শক্তিটা দূরে কাছে এমন জিনিস নেই যাকে টানবে না। ভাবনাটা ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারা গেল একা পৃথিবী নয় সব-কিছুই টানে সব-কিছুকে। তার মধ্যে যেটা আছে বস্তু,

বেশি টানবার জোর অতটা। তাছাড়া সূর্যের সমস্ত দিকে এই টানের জোর খাটে কমে। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে যদি, টান কমে যায় চারগুণ, চারগুণ বাড়লে টান কমবে ষোলো গুণ। এ না হোলে সূর্যের টানে পৃথিবীর যা কিছু সকল সব চূর্ণ হয়ে যেত। এই টানাটানির পালোয়ানিতে হাল্কা জিনিসের পরে পৃথিবীর জিত রয়ে গেল। নিউটনের মৃত্যুর বছর সত্তর পরে আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর পরখ করবার যন্ত্রে দুটো সীসের গোলা ঝুলিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা ঠিক নিয়ম মেনেই পরস্পরকে টানছে। এই নিয়মের হিসাবটি বাঁচিয়ে আমিও এই লেখার টেবিলে বসে সব-কিছুকেই টানছি। পৃথিবীকে, চন্দ্রকে, সূর্যকে, বিশেষ যত তারা আছে তার প্রত্যেকটিকেই, যে পিঁপড়েটা এসেছে আমার ঘরের কোণে আহারের খোঁজে তাকেও টানছি, সেও দূর থেকে দিচ্ছে আমায় টান, বলা বাহুল্য আমাকে বিশেষ ব্যস্ত করতে পারেনি। আমার টানও তেমন ভাবনার কারণ ঘটাল না। পৃথিবী এই টানকে সবার জোরের অসুবিধা ঘটিয়েছে অনেক। চলতে গেলে পা তোলবার দরকার। কিন্তু পৃথিবী টানে তাকে নিজের দিকে; দূরে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি সমস্ত ভারে বিস্তর। এই টেনে রাখার ব্যবস্থা পাহাড়পর্বতের পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু মানুষের পক্ষে একেবারেই নয়। তাই জন্মকাল থেকে মৃত্যু-

কাল পর্যন্ত এই টানের সঙ্গে মানুষকে লড়াই ক'রে চলতে হয়েছে। অনেক আগেই সে আকাশে উড়তে পারত কিন্তু পৃথিবী কিছুতেই তাকে মাটি ছাড়তে দিতে চায় না। এই চব্বিশ ঘণ্টা টানের থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে মানুষ কল বানিয়েছে বিস্তর—তবে পৃথিবীকে কিছু ফাঁকি দেওয়া চলে—সম্পূর্ণ না। কিন্তু এই টানকে অস্বীকার করি যখন ভাবি, পৃথিবী হঠাৎ যদি তার টান আলগা করে তাহলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক খাচ্ছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। ভাগ্যিস্ পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাপে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারিনে।

বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণার মধ্যে দেখলেম যে জুটি জোড়া সেই ব্যাপারটার মতো সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। একদিকে ছাড়াছাড়া মহাস্রোত আর একদিকে জমাজমাটের মহাটান। সবই চলেছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানিনে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানিনে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে, সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তাহলে চলন হোত একেবারে

সিধে রাস্তায় অন্তহীন। টান তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অঙ্কবন্ধে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বহুলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্ব শূন্য পার হয়ে নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদৃশ্য লাগামে বেঁধে গ্রহদেরকে ঘোরাচ্ছে সার্কাসের ঘোড়ার মতো। এদিকে সূর্যও ঘুরছে বহুকোটি সূর্যগামী নক্ষত্র-তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশ্বের অতীসূক্ষ্ম শক্তিকণিকার দিকে তাকাও সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা। সূর্য আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অতিপরমাণু জগতে প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যেকার দূরত্ব কম বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শূন্যকে পেরিয়ে নিত্য পাক খাওয়া পথে ঘোরাচ্ছে ইলেকট্রনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সবকিছু। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইলেকট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্ষের নয়, সেটা বৈদ্যুত টানের। পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের, যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের

মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই যে মতের আলোচনা করা গেল নিউটনের সময় থেকে এটা চলে আসছে। এর থেকে আমাদের মনে এই একটা ধারণা জন্মে গেছে যে দুই বস্তুর মাঝখানের

আকাশের ভিতর দিয়ে একটা অদৃশ্য শক্তি টানাটানি করছে।

কিন্তু এই ছবিটা মনে আনবার বিস্তর বাধা আছে। মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সে-কথা পূর্বে বলেছি। বৈদ্যুতিক শক্তিরও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সে-রকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরো একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না। একটা জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আকাশের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমন কি, আলোককেও এই বাঁকা বিধির বাধা মানতে হয়। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে নিউটনের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে নূতন জ্যামিতির

সাহায্যে এই সংখ্যা আলোকবর্ষের যোগ হিসেব ক'রে জানা, যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।

যাই হোক ইংরেজিতে যাকে প্রোজেক্টাইল বলে তাদের মধ্যাকর্ষ না থাকলে আকাশপথে টান দিলে সোজা ছুটে যায়।

আমাদের এই যে নক্ষত্রজগৎ, এ যেন বিরাট শূন্য আকাশের দ্বীপের মতো। এখান থেকে দেখা যায় দূরে দূরে আরো অনেক নাক্ষত্র দ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে আমাদের নিকটের যেটি, তাকে দেখা যায় অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডলের কাছে। দেখতে একটা ঝাপসা তারার মতো। সেখান থেকে যে আলো চোখে পড়ছে সে যাত্রা ক'রে বেরিয়েছে ন লক্ষ বছর পূর্বে। কুণ্ডলীচক্র-আকারে নীহারিকা আরো আছে আরো দূরে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তীর সম্বন্ধে হিসাবে স্থির হয়েছে যে, সে আছে তিন হাজার লক্ষ আলো-বছর দূরের পারে। বহুকোটি নক্ষত্র-জড়ো-করা এইসব নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না।

একটা আশ্চর্যের কথা উঠেছে এই যে, কাছের দুটো-তিনটে ছাড়া বাকি নাক্ষত্রজগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলি সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দূরে তাদের দৌড়-বেগও তত বেশি। এইসব নাক্ষত্রজগতের সমষ্টি নিয়ে

যে বিশ্বকে আমরা জানি, কোনো কোনো পণ্ডিত ঠিক করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। সুতরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্র-পুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব যাচ্ছে বেড়ে। যে বেগে তাঁরা সরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হবে

অর্থাৎ এই পৃথিবীর ভূস্তরের সময়ের মধ্যে নাক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

শুধু এই নয়, একদল বিজ্ঞানীর মতে এই বস্তুপুঞ্জসংহতিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে। এঁদের মতে আকাশের কোনো-এক বিন্দু থেকে সিধে লাইন টানলে সে লাইন অসীমে চলে না। ফিরে ঘুরে এসে একসময়ে সেই প্রথম বিন্দুকে এসে পৌঁছয়। এই মত অনুসারে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আকাশ-গোলকে নক্ষত্রজগৎগুলি আছে, যেমন আছে পৃথিবী-গোলকের পিঠে জীবজন্তু গাছ-পালা। সুতরাং বিশ্বজগৎটার ফেঁপে-ওঠা সেই আকাশ-মণ্ডলেরই বিস্ফারণ যোগে। কিন্তু মতের স্থিরতা হয়নি এ-কথা মনে রাখা উচিত : আকাশ অসীম, কালও নিরবধি, এই মতটাও মরেনি। আইনস্টাইন খুঁজছেন কি না এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে সৃষ্টি চলেছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নূতন সৃষ্টি উদ্ভাসিত হচ্ছে, ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি এ

প্রহরের পালা দিন ও রাত্রির মতো, বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে, ওরা আদিম সেই অদ্ভুত সেই এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।

পার্সিয়ুস রাশিতে অ্যালগল নামে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তার উজ্জ্বলতা স্থির থাকে আট ঘণ্টা। তার পরে পাঁচ ঘণ্টার শেষে তার প্রভা কমে হয় এক-তৃতীয়াংশ। আবার উজ্জ্বল হোতে শুরু করে। পাঁচ ঘণ্টা পরে পূর্ণ উজ্জ্বলতা পায়, সেই অবস্থা স্থির থাকে আট ঘণ্টা। এইরকম উজ্জ্বলতার কারণ বোঝায় এর জুড়ি নক্ষত্র। প্রদক্ষিণের সময় ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে গ্রহণ ছাড়ে।

আর একদল তারা আছে তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো কারণ থেকে নয়, কিন্তু ভিতরেরই কোনো জোয়ারভাঁটায় একবার বাড়ে একবার কমে। কিছুদিন ধরে সমস্ত তারাটা হয়ে যায় বিস্ফারিত, আবার ক্রমে যায় সংকুচিত হয়ে। তার আলোটা যেন নাড়ীর দপদপানি। সিফিউস নক্ষত্রমণ্ডলীতে এইরকম তারা প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে বলে এদের নাম হয়েছে সিফাইড্‌স। এদের দীপ্তি পরিমাণের দিক থেকে নাক্ষত্র-জগতের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে।

আরো একদল নক্ষত্রের কথা বলবার আছে, তারা নাম পেয়েছে নতুন নক্ষত্র। তাদের আলো হঠাৎ অতিবেগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অনেক হাজার গুণ থেকে অনেক লক্ষ গুণ পর্যন্ত।

তার পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত ম্লান হয়ে যায়। এককালে এই হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা তারাদের আবির্ভাবকে নতুন আবির্ভাব মনে ক'রে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নতুন তারা।

কিছুকাল পূর্বে নোভেটা অর্থাৎ পোর্তিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে একটি, যাকে বলে নতুন তারা, হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। পরে পরে চারটি জ্যোতির খোলস দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলস দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলো-চলা বছর দূরে। অর্থাৎ এই যে তারার প্রকাশ জ্বলনের উৎপাতটা আজ আমাদের চোখে পড়ল এটা ঘটেছিল খ্রীস্টজন্মের সাড়ে ছশো বছর পূর্বে। তার এইসব ছেড়ে-ফেলা গ্যাসের খোলসগুলির কী হোলো এ নিয়ে আলোচনা চলেছে। সে কি এর নক্ষত্র শরীরে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, না ওর টানে বাঁধা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওর আনুগত্য করে চলেছে। এই যে তারা জ্বলে-ওঠা, এ ঘটনাকে বিচার ক'রে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন হয়তো এমনি করেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ থেকেই গ্রহের উৎপত্তি; হয়তো সূর্য একসময়ে এইরকম নতুন তারার রীতি অনুসারে আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। এমত যদি সত্য হয় তাহলে সম্ভবত প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই একসময়ে একটা বিস্ফোরণের দশা আসে, আর

গ্রহ-বংশের সৃষ্টি করে। হয়তো আকাশে নিঃসন্তান নক্ষত্র অসংখ্য আছে।

দ্বিতীয় মত এই যে, বাহিরের একটা চলতি তারা সূর্য আর একটা তারার টানের এলাকার মধ্যে এসে পড়ে ঘটিয়েছে এই প্রলয় কাণ্ড। এই মত অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তির আলোচনা পরে করা যাবে।

আমাদের নাক্ষত্রজগতে যেসব নক্ষত্র আছে তারা নানা রকমের। কেউ বা সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দেয়, কেউ বা দেয় একশো ভাগ কম। কারো বা পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারো বা নিতান্তই পাতলা। তাদের উপরিতলের তাপমাত্রা বিশ-ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড পরিমাণে, কারো বা তিন হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়, কেউ বা নাড়ির তালে প্রসারিত সংকুচিত হতে হতে আলো উচ্ছ্বাসের জোয়ারভাঁটা খেলাচ্ছে, কেউ বা চলেছে একা একা, কারো বা চলেছে জোড় বেঁধে, তাদের সংখ্যা নক্ষত্রদের এক-তৃতীয়াংশ। জুড়ি নক্ষত্রেরা তারাবর্তীদের টানে ধরা পড়ে যাপন করছে প্রদক্ষিণের পালা। জুড়ির মধ্যে যার জোর কম, প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই পরে। যেমন সূর্য আর পৃথিবী। অবশ্য পৃথিবী যে কিছু টান দিচ্ছে না তা নয় কিন্তু সূর্যকে বড়ো বেশি বিচলিত করতে পারে না। প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানটা একা সম্পন্ন করছে পৃথিবীই। যেখানে দুই জ্যোতিষ্ক প্রায় সমান

ওজনের হিসাবে উভয়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, দুই নক্ষত্র সেইটেকেই প্রদক্ষিণ করে।

এই জুড়ি নক্ষত্র কোথা থেকে কী ক'রে এল তা নিয়ে আলাদা আলাদা মত আছে। কেউ কেউ বলেন এর মূলে আছে ঘূর্ণিবৃত্তি। অর্থাৎ ঘোরে যার দেহ তার নীতি অনুসারে একটা থেকে আর একটাকে বাইরে ক'রে আপন সঙ্গী ক'রে রেখেছে। এর মতে ঘূর্ণির জন্য, মূল নক্ষত্রের নিজেরই অংশ থেকে। বুঝিয়ে বলি — নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হয় ততই আঁট হয়ে আসে। এদিকে তাপ যতই কম হল ততই তার ঘূর্ণিপাক হয় দ্রুত। সেই কেন্দ্রাতিগের ঠেলায় প্রবল বেগে মধ্যে বাহিরমুখো বেগ। মাটির চাকা যখন ঘোরে খুব জোরে তখন তার মধ্যে এই বাহিরমুখো বেগ জোর পায় সবাই জান চাকের গায়ে ছিটকে পড়ে, তার পরে জোড়গুলো যদি কাঁচা থাকে তাহলে তার অংশগুলো ভেঙে ছুটে যায়। নক্ষত্রের ঘূর্ণিবেগের জোরে বাড়তে বাড়তে এই বাহিরমুখো বেগ বেড়ে মাঝখানে অবশেষে একদিন সে ভেঙে দুখানা হয়ে যায়। তখন থেকে এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র হয়ে যুগল-যাত্রীর চলা শুরু করে

কোনো কোনো জুড়ির প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ করতে লাগে অনেক হাজার বছর। কখনো দেখা যায় ঘুরতে ঘুরতে একটি আরেকটিকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে

দের, উজ্জ্বলতায় তারা দামী। কিন্তু উজ্জ্বলতায় বিশেষ লোকসান ঘটত না যদি আয়তনকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হ'ত। নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার ভেদ যথেষ্ট আছে। এমনও আছে যে, কোনো নক্ষত্র তার সব দীপ্তি হারিয়েছে। প্রকাণ্ড আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যেসব নক্ষত্র তাদের যাত্রা শুরু করেছে, চিরকাল ধ'রে সমস্ত তহবিল ঠিক, হয়ে গিয়ে চরম খরচ করবার মতো আলোর পুঁজি ফুঁকে দিয়েছে। শেষ দশায় এইরকম তেজহীন নক্ষত্র থাকে অদৃশ্য হয়ে অন্ধকারে।

বেটেলজিয়ুস নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে, তার তাপ কমে আলো সেখানে ফোকা, যার তাপ-ক্ষয় হয়েছে যথেষ্ট: কিন্তু তবু ঝলমল করছে। সেটা আছে অনেক দূরে, পৃথিবীতে তার আলো পৌঁছতে লাগে ১৯০ বছর। আশ্চর্য কথা, আয়তনে এর এত প্রকাণ্ড বিস্তার, নিজের দেহের মধ্যে পঁচিশ কোটি সূর্যকে জায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে অ্যাণ্টারিস নামক নক্ষত্র আছে তার আয়তন বেটেলজিয়ুসের প্রায় দুনো। আবার এমন নক্ষত্র আছে তারা প্রায় সমান বটে কিন্তু তাদের বস্তুপদার্থ ওজনে লোহার চেয়ে অনেক ভারী।

মহাকায় নক্ষত্রদের কায়া যে বড়ো, তার কারণ এ নয় যে, তাদের বস্তুপরিমাণ বেশি, তারা অত্যন্ত বেশি ফেঁপে আছে মাত্র। আবার এমন অনেক ছোটো নক্ষত্র আছে যারা যে

ছোটো তার কারণ তাদের গ্যাসের সমস্ত পরমাণু ঠাসা করে পোঁটলা-বাঁধা। সূর্যের ঘনত্ব এদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জলের চেয়ে কিছু বেশি; কালপুরুষ নক্ষত্রের গুরুভার হবে আমাদের হাওয়ার সমান। কিন্তু সেখানে বায়ুপরিবর্তন করবার কথা যদি চিন্তা করি তাহলে মনে রাখতে হবে পরিবর্তন হবে দারুণ বেশি। আবার এমন তারাও আছে কালপুরুষ-মণ্ডলীভুক্ত লালরঙের দানব তারা বেটেলজিয়ুস এবং বৃশ্চিক রাশির অ্যান্টারেস। এদের ঘনত্ব এত সামান্য যে, পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার একটু তুলনাও চলতে পারে না। বিজ্ঞানপরীক্ষাগারের সব কলে পাম্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।

আবার অপর দিকসীমায় আছে সাদা বামন তারাগুলো। তাদের ঘনত্বের কাছে লোহা প্লাটিনাম কিছুই পৌঁছতে পারে না। অথচ এরা মোটেই কঠিন নয়, এরা গ্যাসময়, সূর্যেরই সগোত্র। তাদের অভ্যন্তরে অত্যুগ্র যে প্রচণ্ড তাপ তাতে ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারা থাকতে পারে না পরমাণুর কাঠামোর মধ্যে,—টুকরো টুকরো মাল বাঁধিয়ে চললে যে জায়গা জুড়ে থাকে তার চেয়ে, অল্প-পরিসরে উচ্ছৃঙ্খল ভিড়, পরমাণুর মধ্যে খাপে ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। পরমাণুর সেই আত্মসমর্পণের অনুপাতে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে যায় ছোটো। এদিকে এই সংকোচনের বে-আইনী

পারিভঙ্গ থেকে উপরে বেড়ে উঠে সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে, ঘন গ্যাস ভারি হয়ে ওঠে প্লাটিনমের তিন হাজার গুণ বেশি। সেইজন্যে বেঁটে তারাগুলো মাপে হয় ছোটো, ওজনে কম হয় না, এমনের বাড়াবাড়িতেও অভ্যাসের ছাড়িয়ে যায়। সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অনুজ্জ্বল সঙ্গী তারা আছে। ইউরেনস গ্রহের মতো ছোটো ওর মাপ, অথচ সূর্যের মতো ওর বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ। সূর্যের ঘনত্ব জলের দেড়গুণের কিছু কম, সিরিয়সের সঙ্গীটির ঘনত্ব জলের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি। একটা দেশলাই-বাক্সের মধ্যে এর পদার্থ ভরলে সেটা ওজনে পঞ্চাশ মন ছাড়িয়ে যাবে। আবার সিরিয়স নক্ষত্রের খুদে সঙ্গীটির ঐ পরিমাণ পদার্থ এখানে হাজার লক্ষ মন যাবে পেরিয়ে। আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ-মত মানেন না। পৃথিবীর যখন নতুন গড়নপিটন হচ্ছিল তখন যাকে জুড়ে হল ঘন পরমাণুর অবিরাম চলছিল, আর যেখানে সমুদ্র কাল সেখানে পাহাড়, কিছুকাল থেকে প্রাকৃত-বিজ্ঞানে এই কথা পড়িয়েছে: কত মত উঠেছে আর নামছে তার ঠিকানা নেই।

আমাদের নক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের দল কেউ পুবের দিকে কেউ পশ্চিমের দিকে নানারকম পথ ধরে চলেছে। সূর্য দৌড়চ্ছে সেকেণ্ডে প্রায় বারো মাইল বেগে, একটা দলের তারা আছে তাদের দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে উধাও হয়ে যায় না; এরা তাকে ঘিরে নানাস্থানে বহুকোটি নক্ষত্র জোট বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা নাভিকেন্দ্রের মতো পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার অঞ্চলেও এই ঘূর্ণিপাক। একদিকে পরমাণুজগতের অনুরূপ অবিরাম চলেছে প্রোটন ইলেকট্রনের ঘূর্ণ-খাওয়া। অনন্তশূন্যে ব্যেপে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত। এইজন্যেই আমাদের ভাষায় বিশ্বকে বলে জগৎ। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে, চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।

নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ, পরিমাণ, পরিবেশ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তাতীত প্রচণ্ডতা দেখে মনেই বিস্ময় বোধ করি এ-কথা মানতে হবে, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং লাভের আর জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র মুহূর্তকালে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের অভি-দেবা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্গমতম গূঢ় ও দুরধিগম্য সত্যের হিসাব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিসে বিপুল সৃষ্টিকে নিরবধি শাসনে কী জানি আর কোনো

থেকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।

সৌরজগৎ

সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রাস্তা, সূর্যের বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্রে। এই চাল এক। আর এক কথা, সূর্য যেদিক দিয়ে আপন মেরুদণ্ডকে বেষ্টন করে ঘুর দেয়, গ্রহরাও সেই দিক দিয়ে পাক খায় আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর থেকে বোঝা যায় সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। তাদের সেই জন্মবিবরণের আলোচনা করা যাক।

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তাদের গায়ে পড়া বা অতিশয় কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এইরকমের একটি দুর্লক্ষণ ঘটনাই ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তখনকার যুগের সূর্যের কাছে। ঐ নক্ষত্রের টানে সূর্য এবং আগন্তুক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উথলে উঠল অগ্নিবাষ্পের জোয়ারের ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাৎ করে থাকবে, বাকিগুলো সূর্যের প্রবল টানে তখন থেকে ঘুরতে লাগল

সূর্যের চারদিকে। তেমন ছড়িয়ে দিয়ে এরা সূর্যের অংশে বিভক্ত হয়েছে। সেই ছোটো-বড়ো জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরো-গুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি; পৃথিবী তাদের মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে আকার ধরেছে। আকাশের নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, প্রায় পাঁচ-ছ হাজার কোটি বছরে একবারমাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহ-সৃষ্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে, গ্রহপরিবারওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু ওস্তাদের বস্তু-বেলুনরূপী বিশ্ব ফেঁপে উঠছে নক্ষত্ররা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এমন যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে পূর্বযুগে আকাশমণ্ডল যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তাদের পরস্পর ঠোকাঠুকির ব্যাপার সচরাচর ঘটত বলে ধরে নিতে হয়। সেই নক্ষত্রঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্রেরই ছিল অংশ থেকে গ্রহ উৎপত্তি-সম্ভাবনা। কিন্তু সে-সব যুক্তিসাপেক্ষ। যে অবস্থায় আমাদের সূর্য আর সূর্যের ঠেলা বেধেছিল সেই অপঘাত সেই সংকুচিত বিশ্বের দিনে এখনকার হিসাবকে দুঃসম্ভাবনীয় ছিল না বলেই মনে করে নিতে হবে। যাঁরা এই মত মেনে নেননি তাঁদের অনেকে বলেন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন সে ফাটা বিযুক্ত

বাজের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম অজস্র গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে বিনা দূরবীন ছাড়া কখনো দেখা যায়নি। একসময় হঠাৎ নৌশিকে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েকমাস পরে ধাপে ধাপে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, পূর্বের মতোই তাকে দূরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে অগ্নিবাষ্প চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি করতে পারে বলে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদলে কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র তারও যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে পাবার মতো বড়ো দূরবীনের দরকার তা আজও তৈরি হয়নি।

অল্প কিছুদিন হোলো কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত লিট্লটন্ সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র

পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের সূর্যেরও একটি জুড়ি ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আর একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে এই জুড়িদের গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেকদূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চলে যেতে যেতে পরস্পর আকর্ষণের জোরের মধ্যে বড়ো একটা জ্বলন্ত বাষ্পের টানা সূত্র বের হয়ে এসেছিল; তারই টুকরো জমিয়ে গিয়ে হল এদের উপগ্রহের উপাদানসামগ্রী। এই গ্যাসপুঞ্জের যে অংশ সূর্যের এবং টানে আটকা পড়ে গেল সেই বন্দী-করা গ্যাসের থেকেই জন্মেছে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। এরা আয়তনে ছোটো বলেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে দেরি লাগল না; তাপ কমতে কমতে গ্যাসের টুকরোগুলো প্রথমে হোলো তরল, তার পর আরো ঠাণ্ডা হয়েই এদের শক্ত হয়ে ওঠবার দিন এল।

এ কথা মনে রেখো এ-কল্পনা আজ পর্যন্ত সকলের নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।

বলা আবশ্যক, সূর্যের সমস্তটাই গ্যাস। পৃথিবীর যেসব উপাদান মাটি ধাতু পাথরে শক্ত, তাদের সমস্তই সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপে আছে গ্যাসের অবস্থায়। বর্ণলিপিযন্ত্রের রেখাপাত থেকে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিরীটিকার অতি সূক্ষ্ম গ্যাস-আবরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই স্তর পেরিয়ে যত ভিতরে যাওয়া যাবে, ততই

দেখা দেয় সবচেয়ে গরম এবং উজ্জ্বল অংশ। সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় দশহাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির কাছে, আরো ভেতরে নিচে নামতে নামতে এমন স্তরে পৌঁছয় সেখানে ঠাসা গ্যাসের আর স্বচ্ছতা নেই। এই জায়গায় তাপমাত্রা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রির চেয়ে বেশি। সবশেষে কেন্দ্রে গিয়ে পাওয়া যাবে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ ডিগ্রির তাপ। সেখানে সূর্যের দেহবস্তু কঠিন লোহা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ঘন অথচ গ্যাসময়।

সূর্যের দূরত্বের কথাটা অঙ্ক দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যাক। আমাদের দেহে যেসব অনুভূতি ঘটছে তাদের সঙ্গে মনের খবর-চালাচালির ব্যবস্থা করেছে অসংখ্য স্নায়ুনাড়ী। এই নাড়ীগুলি আমাদের শরীর ব্যাপ্ত করে মিলেছে মস্তিষ্কে গিয়ে। টেলিগ্রাফের তারের মতো তাদের যোগে চকিতে খবর আসে, আমরা জানতে পারি কোথায় পিঁপড়ে কামড়াল, কিংবা যে আগুন আগুনে সেঁকা ডিশ্‌টা, যে জ্বলন্ত বাতি হাতের ছুঁলুম সে গরম। আমাদের শরীরটা হাওড়া থেকে বর্ধমানের মতো লম্বা নয়, তাই খবর পেতে দেরি হয় না। তবু তাতে একটু সময় লাগেই; সে এতই অল্প যে তা মাপা শক্ত। কিন্তু পণ্ডিতেরা মেপে দেখেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক বার্তা

মস্তভূমিতে পৌঁছিয়ে গেছে প্রায় একশো কুড়ি বছরে। মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌঁছতে পারে। ছেলেমানুষী কৌতূহলে হাত যদি হঠাৎ ঠেকে, সূর্যের গা তৎক্ষণাৎই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো কুড়ি বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।

সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লাখ ৩০ হাজার গুণ বেশি, তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। এই টানের জোরে সূর্য পৃথিবীকে আপন আয়ত্তে বেঁধে রাখে, কিন্তু দৌড়ের জোরে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে।

গোল আলুর ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যদি একটা শলা চালিয়ে দেওয়া যায় আর সেই শলাটার চারদিকে যদি আলুটাকে ঘোরানো যায়, তাহলে সেই ঘোরা যেমন হয় সেইরকম হয় চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর একবার করে ঘুর-খাওয়া। আমরা বলি, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চার-দিকে ঘুরছে। আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই যে, তার এরকম কোনো শলা নেই। মেরুদণ্ড

কোনো দণ্ডই নয় — যে জায়গাটিতে দণ্ড থাকতে পারত কাল্পনিক সোজা লাইনের সেই জায়গাটাকেই বলি মেরুদণ্ড। যেমন লাটিম। সে ঘোরে, আপন মাঝখানের এমন একটা খাড়া লাইনের চারদিকে, যে লাইনটা চলে গেছে কেন্দ্র।

মেরুদণ্ডের চারদিকে পৃথিবীর একবার পাক খেতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। সূর্যও আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরে। সূর্যের কতখানি লাগে তা যে উপায়ে জানা গেছে সে-কথা বলি। খুব জোরের দূরবীন লাগিয়ে চোখ বাঁচিয়ে যদি এখন সূর্যের দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে। এক-একটি কালো দাগ সময় সময় এত বড়ো হয়ে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ একত্র করলেও তার সমান হয় না। ছোটো দাগগুলি মিলিয়ে যেতে বেশি-দিন লাগে না, কিন্তু বড়ো বড়ো দাগ দু-তিন সপ্তাহ থাকে। দূরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা ক্রমাগত একদিকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের সবাইকে সাথে নিয়ে সূর্য। এই কালো দাগের অনুসরণ করে এই ঘুরে যাওয়ার সময়টার হিসাব পাওয়া গেছে; প্রমাণ হয়েছে যে, পৃথিবী যেখানে চব্বিশ ঘণ্টায়, সূর্য সেখানে ছাব্বিশ দিনে।

সূর্যের দাগগুলো সূর্যের বাইরের আবরণে প্রকাণ্ড আবর্ত গহ্বর। সেখান দিয়ে ভিতর থেকে উত্তপ্ত গ্যাস কুণ্ডলী আকারে ঘুরতে ঘুরতে উপরে বেরিয়ে আসছে। এর কেন্দ্র

প্রথমে ঘোর কালো, তার নাম অম্ব্রা; তার চারদিকে কম কালো বেষ্টনী, তার নাম পেনাম্ব্রা। এদের কালো দেখতে হয়েছে চারপাশের দীপ্তির তুলনায়,— সেই আলো যদি বন্ধ করা যেত তাহলে অতি তীব্র দেখা যেত এদের জ্যোতি। সূর্যের যে দাগ খুব বড়ো তার কোনো-কোনোটার অম্ব্রার এক পার থেকে আর এক পারের মাপ পঞ্চাশ হাজার মাইল, কেউ লক্ষ মাইল তার পেনাম্ব্রার মাপ।

সূর্যের এইসব দাগের কমা-বাড়ার প্রভাব পৃথিবীর উপরে নানারকমে কাজ করে। যেমন আমাদের আবহাওয়ায়। প্রায় এগারো বছরের পালাক্রমে সূর্যের দাগ বাড়ে কমে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বনস্পতির গুঁড়ির মধ্যে এই দাগি বৎসরের সাক্ষ্য ধরা পড়েছে। গাছের গুঁড়ি কাটলে তার মধ্যে দেখা যায় প্রতি বৎসরের একটা করে চক্রচিহ্ন। এই চিহ্নগুলি কোনো কোনো জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি কোনো কোনো জায়গায় ফাঁকা ফাঁকা। প্রত্যেক চক্রচিহ্ন থেকে বোঝা যায় গাছটা বৎসরে কতখানি করে বেড়েছে। আমেরিকার এরিজোনার মরুপ্রায় প্রদেশে ডাক্তার ডগলাস দেখেছেন যে যে-বছরে সূর্যের কালো দাগ বেশি দেখা দিয়েছে সেই বছরে গুঁড়ির দাগটা চওড়া হয়েছে বেশি। এরিজোনার পাইন গাছে পাঁচশো বছরের চিহ্ন গুনতে গুনতে ১৬৫০ থেকে ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সূর্যের দাগের সম্বন্ধে একটা ফাঁক পড়ল।

অবশেষে তিনি গ্রীনিচ মানমন্দির বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন এ ক'টা বছরে সূর্যের দাগ প্রায় ছিল না।

সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্য ভাগ গ্রহগুলিকে ঠেকে। অনেকখানিই চলে যায় শূন্যে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে; কোনো নক্ষত্রে পৌঁছয় চার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ত্রিশ হাজার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ন লক্ষ বছরে। আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর ওর আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তার পরে সূর্যের এই আলোকের মূল পুঁজি আর ফেরে না, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন্ কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতিষ্কলোকদের সম্বন্ধে একটা আলোচনা বাকি রয়ে গেল। কোথা থেকে নিরন্তর তাদের তাপের জোগান চলছে তার সন্ধান করা দরকার পরমাণুদের মধ্যে।

ইলেকট্রন প্রোটনের যোগে যদি কখনো একটি হেলিয়মের পরমাণু সৃষ্টি করা যায় তাহলে সেই সৃষ্টিকার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হবে তার আঘাতে আমাদের পৃথিবীতে এক সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। এ তো গেল তেজোদ্ভবের কথা। কিন্তু বস্তু ধ্বংস করতে তার চেয়ে অনেকগুণ তীব্র শক্তির প্রয়োজন। প্রোটন ইলেকট্রন যদি সংঘাত ঘটে ফাটিয়ে সূর্যের কিরণ

বিকিরণ করবে যখনি তাপ মিলিয়ে যাবে। এতে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হয় তা কল্পনাতীত।

এইরকম ভাঙচুর ঘটছে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে; সেখানে বস্তুনাশের কাজ চলছে বলেই 'প্রজ্বলিত করে' মশাল। এই মত অনুসারে সূর্য তিনশো চার লক্ষ কোটি টন ওজনের বস্তুপুঞ্জ প্রত্যহ খরচ করে ফেলছে। কিন্তু সূর্যের আয়তন এত বৃহৎ যে আরো বহু লক্ষ কোটি বৎসর এইরকম অপব্যয়ের উড়নচণ্ডী চালাতে পারবে। কিন্তু বর্তমান বিশেষ অণু সম্বন্ধে যে শেষ হিসাব অবধারিত হয়েছে সেটা জেনে নিলে বস্তু-ভাঙনের চেয়ে বস্তু-গড়নের মতটাই বেশি খাটে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একসময়ে সূর্য ছিল হাইড্রোজেনের পুঞ্জ, তাহলে সেই হাইড্রোজেন থেকে হেলিয়ম গড়ে উঠতে যে তেজ জাগবার কথা সেটা একেবারে হিসাবের সঙ্গে মেলে।

আসলে এই বিশ্বব্যাপারটা ক্ষয়েরই দিকে, না, গড়ে ওঠবার দিকে চলছে, না, দুই একসঙ্গে ঘটছে সে-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের মতের মিল হয়নি। কয়েক বৎসর হোলো যে মিলিকানরশ্মি ধরা পড়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে কস্মিক রশ্মি সেটার উদ্ভব না পৃথিবীতে না সূর্যে, এমন কি, না নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্র-পরপারের কোনো আকাশ হতে বিশ্বসৃষ্টির ভাঙন কিংবা গড়ন থেকে সে বেরিয়ে পড়ছে এইরকম আন্দাজ করা হয়েছে।

যাই হোক বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারের এই যে সব বিপরীত সংকেত-ইশারা আসছে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে সেটা হয়তো কোনো একটা কঠিন গণনার ব্যাপারে এসে ঠেকবে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই, বুঝতে পারিনে হঠাৎ অঙ্কের আরম্ভ হয় কোথা থেকে, একেবারে শেষই বা হয় কোনখানে। সম্পূর্ণ-সংহতিতে বিশ্বকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা আরম্ভ হোলো তার মহাসমুদ্র দিগন্তের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ মিশে হবে আমাদের বুদ্ধিতে এক বিস্ময়ের শামিল। বিজ্ঞানী বললেন, বুদ্ধির কথা এখানে আসছে না, এ কেবলই গণনার কথা; সে গণনা বর্তমান বৈজ্ঞানিকের উপরে প্রতিষ্ঠিত— তার বাইরে অন্তে যদি অন্ধকার দেখি তাহলে উপায় নেই।

৭

গ্রহলোক

গ্রহ কাকে বলে সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্য হোলো নক্ষত্র, পৃথিবী হোলো গ্রহ, সূর্য থেকে ছিটকে-পড়া টুকরো, ঠাণ্ডা হয়ে তার আলো গেছে নিবে। কোনো গ্রহেরই আপন আলো নেই। সূর্যের চারদিকে এই গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ডিম্বরেখাকারে; কারো বা পথ সূর্যের কাছে, কারো বা পথ সূর্য থেকে বহুদূরে। সূর্যকে ঘুরে আসতে কোনো গ্রহের এক বছরের কম লাগে, কারো বা একশো বছরের বেশি। যে-গ্রহেরই ঘুরতে যত সময় লাগুক এই ঘোরার সম্বন্ধে একটি বাঁধা নিয়ম আছে তার কখনোই ব্যতিক্রম হয় না। সূর্যপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় প্রত্যেকে সূর্য থেকে একই ঝাঁকানির ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে, তাই চলবার ঝোঁক হয়েছে একই দিকে। চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়বার সময় গাড়ি যে মুখে চলেছে সেইদিকে শরীরের উপর একটা ঝোঁক আসে। গাড়ি থেকে পাঁচজন নামলে পাঁচজনেরই সেই একদিকে হবে ঝোঁক। তেমনি ঘূর্ণমান সূর্য থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে ঝোঁক পেয়েছে।

দলের এই চলার প্রবৃত্তি থেকে বলা যায় ওরা সবাই একজাতের, সবাই একঘেঁষা।

সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধগ্রহ, ইংরেজিতে যাকে বলে মার্করি। সে সূর্য থেকে সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে। পৃথিবী যতটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বুধের গায়ে ঝাপসা কিছু কিছু দাগ দেখা যায়, সেইটে লক্ষ্য করে বোঝা গেছে কেবল ওর এক পিঠ ফেরানো সূর্যের দিকে। সূর্যের চারদিক ঘুরে আসতে ওর লাগে ৮৮ দিন। নিজের মেরুদণ্ড ঘুরতেও লাগে তাই। সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর দৌড়, প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। বুধগ্রহের দৌড় তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল। একে ওর রাস্তা ছোটো, তাতে ওর চালও বেশি, তাই পৃথিবীর তিন মাসে ওর প্রদক্ষিণ সারা হয়ে যায়। বুধগ্রহের প্রদক্ষিণের যে পথ, সূর্য ঠিক তার কেন্দ্রে নেই, একটু এক পাশে আছে। সেইজন্যে ঘোরবার সময় বুধগ্রহ কখনো সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে কখনো যায় দূরে।

এই গ্রহ সূর্যের এত কাছে থাকাতে তাপ পাচ্ছে খুব বেশি। অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, ইংরেজিতে তার নাম thermo-couple। তাকে দূরবীনের সঙ্গে জুড়ে গ্রহতারার তাপের খবর জানা যায়।

এই মতের হিসাব অনুসারে, বুধগ্রহের যে অংশ সূর্যের দিকে ফিরে থাকে তার তাপ সীসে টিন গলাতে পারে। এই তাপে বাতাসের অণু এত বেশি বেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে যে বুধগ্রহ তাদের ধরে রাখতে পারে না, তারা দেশ ছেড়ে শূন্যে দেয় দৌড়। বাতাসের অণু পলাতক স্বভাবের। পৃথিবীতে তারা সেকেণ্ডে দুই মাইলমাত্র বেগে ছুটোছুটি করে, তাই টানের জোরে পৃথিবী তাদের সামলিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাপ বেড়ে উঠে অণুদের দৌড় হোত সেকেণ্ডে সাত মাইল, তাহলেই পৃথিবী আপন বায়ুমণ্ডলকে আর বশ মানাতে পারত না।

যেসব বিজ্ঞানী বিশ্বগ্রহের হিসাবনিকেশ তাদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রহ নক্ষত্রের ওজন ঠিক করা। এ-কাজে সাধারণ দাঁড়িপাল্লার ওজন চলে না, তাই কৌশলে ওদের খবর আদায় করতে হয়। সেই কথাটা বুঝিয়ে বলি। মনে করো একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধাক্কা, সে পড়ল দশ হাত দূরে। কতখানি ওজনের গোলা এসে জোর লাগালে মানুষটা এতখানি বিচলিত হয়, তার নিয়মটা যদি জানা থাকে তাহলে এ দশ হাতের মাপটা দিয়ে গোলাটার ওজন অঙ্ক কষে বের করা যেতে পারে। একবার হঠাৎ এইরকম অঙ্ক কষার সুযোগ ঘটাতে বুধগ্রহের ওজন মাপা সহজ হয়ে গেল। সুবিধাটা ঘটিয়ে দিলে একটা ধূমকেতু।

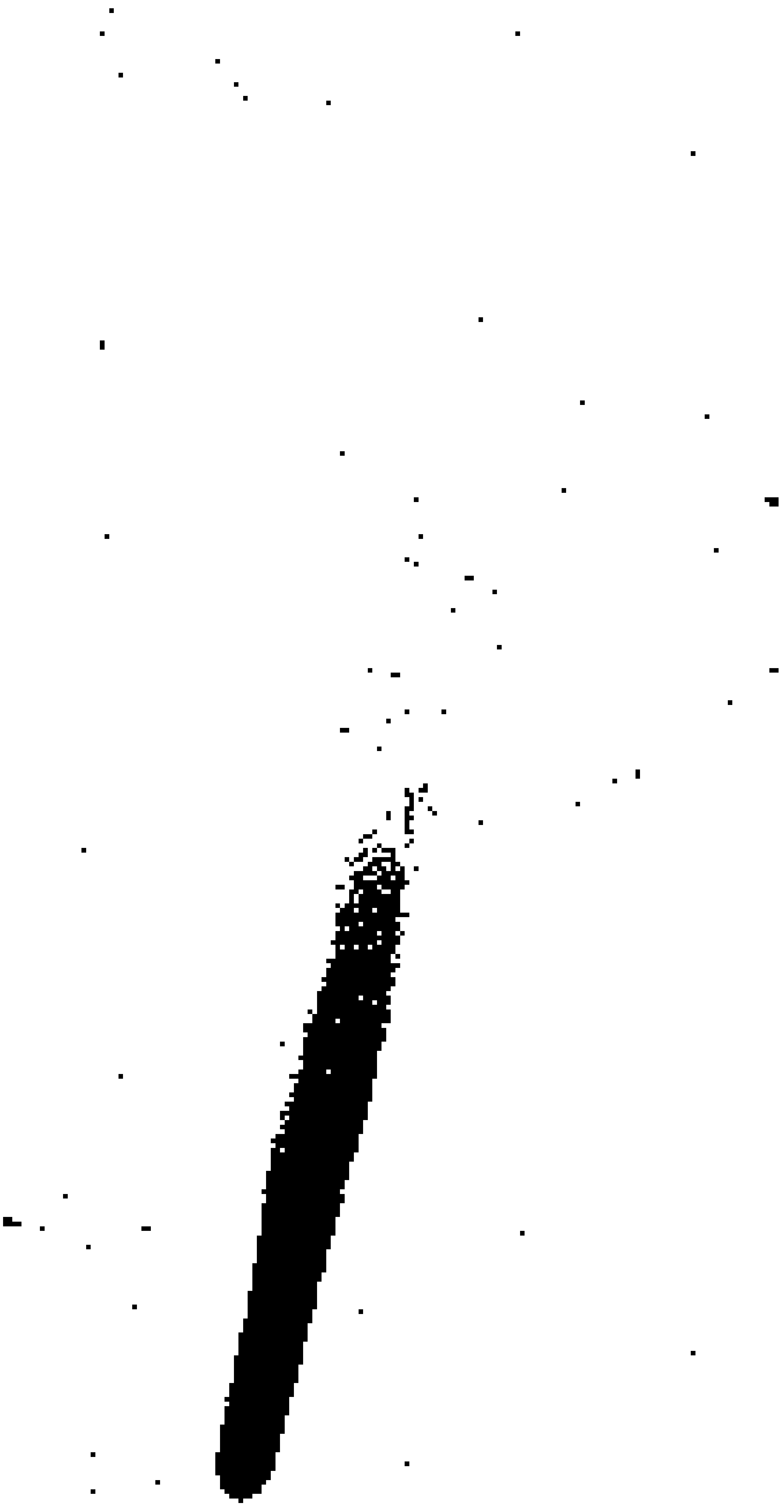

সে-কথাটা বলবার আগে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ধূমকেতুরা কী রকম ধরনের জ্যোতিষ্ক।

ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। এর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই চোখে ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতিসূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনো কখনো তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, অথচ সেটা অনুভব করতে পারিনি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্যের বাঁধা অনুচরদেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তুক।

একবার একটি ধূমকেতুর পরিভ্রমণপথে ঘটল অপঘাত। বুধের কক্ষপথের পাশ দিয়ে যখন সে চলছিল তখন বুধের সঙ্গে টানাটানিতে তার পথের হল বদল। গোলমাল: রেলগাড়ি রেললাইন ছেড়ে খানায় কাকে ঠেলে ঠেলে ঘোরা হয় কিম্বা টাইম-টেবিলের সময় পেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাই ঘটল। ধূমকেতুটা আপন পথে যখন ফিরল তখন তার নির্দিষ্ট সময় হয়েছে উত্তীর্ণ। ধূমকেতুকে যে পরিমাণ কাঁপিয়ে দিয়ে বুধগ্রহের যতখানি টানের জোর লেগেছিল তাই নিয়ে চলল অঙ্ককষা। যার ভরটা যেমন সেই পরিমাণ জোরে সে টান লাগায় এটা জানা কথা, এর থেকেই বেরিয়ে পড়ল

বুধগ্রহের ওজন। দেখা গেল তেইশটা বুধগ্রহের বাটখারা চাপাতে পারলেই তবেই তা পৃথিবীর ওজনের সমান হয়।

বুধগ্রহের পরের রাস্তাতেই আসে শুক্রগ্রহের প্রদক্ষিণের পালা। তার ২২৫ দিন লাগে সূর্য ঘুরে আসতে। অর্থাৎ আমাদের সাড়ে সাত মাসে তার বৎসর। ওর মেরুদণ্ড-সোজা ঘূর্ণিপাকের বেগ কতটা তা নিয়ে এখনো তর্ক শেষ হয়নি। এই গ্রহটি বছরের এক সময়ে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিকে দেখা দেয়, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা, আবার এই গ্রহই আর একসময়ে সূর্য ওঠবার আগে পূর্বদিকে ওঠে তখন তাকে শুকতারা বলে জানি। কিন্তু মোটেই এ তারা নয়, খুব উজ্জ্বল বলেই সাধারণের কাছে তারা-খেতাব পেয়েছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অল্প একটু কম। এই গ্রহের পথ পৃথিবীর পথের চেয়ে আরো তিন কোটি মাইল সূর্যের কাছে। সেও কম নয়। যথোচিত দূর বাঁচিয়ে আছে তবু এর দিনরাত্রের খবর ভালো করে পাইনে। সে সূর্যের আলোর প্রখর আবরণের আড়ালে নয়। বুধকে ঢেকেছে সূর্যেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন শুক্রগ্রহের যে উত্তাপ তাতে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই এখানে জলাশয় আর মেঘ দুইয়েরই অস্তিত্বই আশা করতে পারি।

মেঘের উপস্থিতি থেকে যতটা আন্দাজ করা যায় তাতে

জানা হয় এই গ্রহের অক্সিজেন-সম্বল নিতান্তই সামান্য। এখানে যে গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় সে হচ্ছে অঙ্গারিক গ্যাস। সেখানে উপরের স্তরেও তার পরিমাণ পৃথিবীর ঐ গ্যাসের চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি। পৃথিবীর এই গ্যাসের প্রধান ব্যবহার লাগে গাছপালার খাদ্য জোগাতে।

এই আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বল-চাপা। তার ভিতরের গরম বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং শুক্রগ্রহের উপরিতল ফুটন্ত জলের মতো, কিংবা তার চেয়ে বেশি উষ্ণ।

শুক্রে কোনো বাষ্পের লক্ষণ যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা। শুক্রের ঘন মেঘ তাহলে কিসের থেকে যে কথা ভাবতে হয়। সম্ভব এই যে মেঘের উপরকার ঠাণ্ডায় জল এত জমে গেছে যে তার থেকে বাষ্প পাওয়া যায় না।

এ কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয়। পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথমযুগে যখন গলিত বস্তুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল তখন অনেক পরিমাণে জোলো বাষ্প আর আঙ্গারিক গ্যাসের উদ্ভব হোলো। তাপ যতই কমতে লাগল জোলো বাষ্প জল হয়ে এককালে সমুদ্র বিস্তার করে দিলে। তখন বাতাসে যেসব গ্যাসের প্রাধান্য ছিল তারা নাইট্রোজেনের মতো সব নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অক্সিজেন-গ্যাসটা তৎপর জাতের মিশুক, অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ

তৈরি হল তার খাদ্য   এমনি করে নিজেকে সে রূপান্তরিত করতে থাকে। অবশেষে পৃথিবীর হাওয়ায় একটা পরিমাণ অক্সিজেন বিশুদ্ধ হয়ে টিঁকল কী ক'রে।

তার প্রধান কারণ পৃথিবীর গাছপালা। উদ্ভিদেরা বাতাসের আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অঙ্গারপদার্থ নিয়ে নিজেদের কাঠামো তৈরি করে, মুক্তি দেয় অক্সিজেনকে। তার পরে প্রাণীদের নিশ্বাস ও নানাপ্রকার পচানি থেকে আবার আঙ্গারিক গ্যাস উঠে আপন তহবিল পূরণ করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রাণের বড়ো সহায়টা কারই জোগানো শুরু যখন সামান্য কিছু অক্সিজেন ছিল সেই আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে। এই উদ্ভিদের পালা যতই বেড়ে চলল ততই তাদের নিশ্বাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুললে। কমে গেল আঙ্গারিক গ্যাস।

অতএব সম্ভবত শুক্রগ্রহের অবস্থা সেই আদিকালের পৃথিবীর মতো। একদিন হয়তো কোনো দিকে উদ্ভিদ দেখা দেবে, আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অক্সিজেনকে ছাড়া দিতে থাকবে। তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু। চাঁদ আর বুধগ্রহের অবস্থা ঠিক এর উলটো। সেখানে জীবপালনযোগ্য হাওয়া টানের দুর্বলতাবশত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহের পরের আসনটা পৃথিবীর।

অন্তঃ গ্রহদের কথা শেষ ক'রে তার পরে পৃথিবীর খবর নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর পরের পংক্তিতেই মঙ্গলগ্রহের স্থান। এই লাল রঙের গ্রহটি অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ৬৮৭ দিন। যে পথে এ সূর্যের প্রদক্ষিণ করছে তা অনেকটা ডিমের মতো; তাই ঘোরার সময় একবার সে থাকে সূর্যের কাছে আবার যায় দূরে। আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে এ গ্রহের ঘুরতে লাগে পৃথিবীর চেয়ে আধঘণ্টা মাত্র বেশি, তাই সেখানকার দিনরাত্রি আমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহে যে-পরিমাণ বস্তু আছে, তা পৃথিবীর বস্তুমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ, তাই টানবার শক্তিও সেই পরিমাণে কম।

সূর্যের টানে মঙ্গলগ্রহের ঠিক যে-পথ বেয়ে চলা উচিত ছিল, তার থেকে ওর চাল একটু তফাত। পৃথিবীর টানে ওর এই দশা। এমন অনুমানের উপরে লোকে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে কতখানি টলিয়েছে সেইটে হিসেব করে পৃথিবীর ওজন ঠিক হয়েছে। এইসূত্রে সূর্যের ওজনও ধরা পড়ল। কেননা মঙ্গলকে সূর্যও টানছে পৃথিবীও টানছে, সূর্য কতটা পরিমাণে দূরে থাকলে দুই টানে কাটাকাটি হয়ে মঙ্গলের এইটুকু বিচলিত হওয়া সম্ভব সেটা গণনা ক'রে বের করা

যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহ বিশেষ বড়ো গ্রহ নয়, তার ওজনও অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং সেই অনুপাতে টানের জোর বেশি না হওয়াতে তার হাওয়া খোওয়াবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে আছে ব'লে একটা তাপ পায় না যাতে হাওয়ার অণু খরবেগে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে। মঙ্গল-গ্রহের হাওয়ায় অক্সিজেন সন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য কিছু থাকতে পারে। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙে অনুমান হয় সেখানকার পাথরগুলো অক্সিজেনের সংযোগে সম্পূর্ণ মরচে-পড়া হয়ে গেছে। আর জলীয় বাষ্পের যা চিহ্ন পাওয়া গেল তা পৃথিবীর জলীয় বাষ্পের শতকরা পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় এই যে অকিঞ্চনতার লক্ষণ দেখা যায় তাতে বোঝা যায় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে একদিন আপন সম্বল খুইয়ে এই দশায় পৌঁছবে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চেয়ে মঙ্গল থেকে তার দূরত্ব বেশি অতএব নিঃসন্দেহ এ গ্রহ অনেকটা ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিষুবপ্রদেশে হয়তো কিছু গরম থাকে কিন্তু রাতে নিঃসন্দেহ বরফজমা শীতের চেয়ে আরো অনেক শীত বেশি। বরফের টুপি-পরা তার মেরুপ্রদেশের তো কথাই নেই।

এই গ্রহের মেরুপ্রদেশে বরফের টুপিটা বাড়ে কমে, মাঝে মাঝে তাদের দেখাও যায় না। এই গরম-খাওয়া টুপির আকারপরিবর্তন দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই মেরুদেশের

অনেকটা তার মরুর মতো শুকনো। কেবল গ্রীষ্মঋতুতে কোনো কোনো অংশ শ্যামবর্ণ হয়ে ওঠে, সম্ভবত জল চলার রাস্তায় বরফ গলার দিকে গাছপালা গজিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলছে অনেকদিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা খাঁড়ি দেখতে পেলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দারা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্যে খাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন, ওটা চোখের ভুল। ইদানীং জ্যোতিষ্কলোকের দিকে মানুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরায় তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা যায়। কিন্তু ওগুলো যে কৃত্রিম খাল, আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এখানে হাওয়া জল আছে।

দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির একপাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা, অন্য-একটির সাড়ে সাত ঘণ্টা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের একদিন-রাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীঘ্র।

মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেক-খানি ফাঁকা জায়গা দেখে পণ্ডিতেরা সন্দেহ ক'রে খোঁজ করতে

লেগে গেছেন। প্রথমে অতি ছোটো চারটি গ্রহ দেখা দিল। তারপরে দেখা দিল কয়েক হাজার টুকরো-গ্রহের ভিড়। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। এদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids। প্রথম যার খবর পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে সীরিস (Ceres), তার ব্যাস চারশো পঁচিশ মাইল। ইরোস (Eros) বলে একটি গ্রহিকা আছে, সূর্যপ্রদক্ষিণের সময় সে পৃথিবীর যত কাছে আসে, এমন আর কোনো গ্রহই আসে না। এরা এত ছোটো যে এদের ভিতরকার কোনো বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। এদের সবগুলোকে জড়িয়ে যে ওজন পাওয়া যায় তা পৃথিবীর ওজনের সিকি ভাগের কম। মঙ্গলের চেয়ে কম, কইলে মঙ্গলের চেয়ে পড়ে তিন ভাগিয়ে কিছু বেশি বাকি।

এই টুকরো-গ্রহগুলিকে কোনো একটা আস্ত-গ্রহেরই ভগ্নশেষ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা এখন সে-কথা যথার্থ নয়। বলা যায় না কী কারণে এরা জোট বেঁধে এক আকার ধরতে পারেনি।

এই গ্রহিকাদের প্রসঙ্গে আর-এক দলের কথা বলা উচিত। আকারে অতি ছোটো, তারাও ঝাঁক বেঁধে চলে এবং নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে, তারা উল্কাপিণ্ডের দল। পৃথিবীতে অনবরতই তাদের বর্ষণ চলছে, ধুলোর সঙ্গে

তাদের যে ক্ষতি ঘটেছে সে বড়ো কম নয়। পৃথিবীর উপরে হাওয়ার চাদরটা না থাকলে এইসব ছুটন্ত শত্রুর আক্রমণে আমাদের রক্ষা থাকত না।

উল্কাপাত দিনে রাতে কিছু না কিছু হয়েই থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উল্কাপিণ্ডের ভিড় হয় বেশি। ২১শে এপ্রিল, ৯, ১০, ১১ই আগস্ট, ১২, ১৩, ১৪ই ও ২৭শে নভেম্বরের রাত্রে এই উল্কাবৃষ্টির আতশবাজি দেখবার মতো জিনিস। এ-সম্বন্ধে নিয়মের বাঁধাবাঁধি দেখে বিজ্ঞানীরা কারণ খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ওদের একটা বিশেষ পথ আছে। কিন্তু গ্রহদের মতো ওরা একা চলে না, ওরা ঝাঁকেঝাঁকে দলবাঁধা পতঙ্গদের মতো। লাখ লাখ চলেছে ভিড় ক'রে এক রাস্তায়। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবী গিয়ে পড়ে ঠিক ওদের এখানে ভিড়ে। পৃথিবীর টান ওরা সামলাতে পারে না। রাশি রাশি বর্ষণ হোতে থাকে। পৃথিবীর ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। কখনো কখনো বড়ো বড়ো টুকরোও পড়ে, মিউজিয়মে [illegible] জায়গার ক'রে নেয়। সূর্যের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ক'রে বিপন্ন হয়েছে এমন ধূমকেতুর এরা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এমন কথাও শোনা যায় তরুণ বয়সে পৃথিবীর অন্তরে যখন তাপ ছিল বেশি, তখন অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরের সামগ্রী এত উপরে ছুটে

দিয়েছিল যে পৃথিবীর টান এড়িয়ে গিয়ে সূর্যের চারদিকে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে কারো নাগাল পেলেই আবার তাদের পৃথিবী নেয় টেনে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই উল্কার যেন ঝরির ছুটি হোতে থাকে। আবার এমন অনেক উল্কা-পিণ্ডের সন্ধান মিলেছে যারা সৌরমণ্ডলীর বাহির থেকে এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর টানে। বিশ্বের কোথাও হয়তো একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল যার উন্মাদনায় বস্তুপিণ্ড ভেঙে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উল্কার দল আজ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই অতিক্ষুদ্রদের পরের বাইরেতেই দেখা দেয় অতিমস্ত বড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।

এই বৃহস্পতিগ্রহের কাছ থেকে কোনো পাকা খবর প্রত্যাশা করার পূর্বে দুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, আর তার আয়তন। পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি মাইলের কিছু উপর আর বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি। পৃথিবী সূর্যের যতটা তাপ পায়, বৃহস্পতি পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এককালে জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেছিলেন যে, বৃহস্পতি-গ্রহ পৃথিবীর মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি, তার নিজের মধ্যেই তাপের সঞ্চয় আছে। তার বায়ুমণ্ডলে সর্বদা যে চঞ্চলতা দেখা যায় তার নিজের অন্তরের তাপই তার কারণ।

কিন্তু যখন বৃহস্পতির তাপমাত্রার হিসাব করা সম্ভব হোলো তখন দেখা গেল এইটি অত্যন্তই ঠাণ্ডা। বরফজমা শৈত্যের চেয়ে আরও ২৮০ ফারেনহাইট ডিগ্রির তলায় পৌঁছায় তার তাপমাত্রা। এত অত্যন্ত বেশি ঠাণ্ডায় বৃহস্পতির জোলো বাষ্প থাকতেই পারে না। তার বায়ুমণ্ডল থেকে দুটো গ্যাসের নিশানা পাওয়া গেল: একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া, নিশাদলে যার ঝাঁঝগন্ধ চেনা আছে, আর একটা আলেয়া গ্যাস, মাঠের মধ্যে পথিকদের পথ ভোলাবার জন্যে যার নাম আছে। নানাপ্রকার যুক্তি দিয়ে আপাতত স্থির হয়েছে যে, বৃহস্পতির দেহ কঠিন, প্রায় পৃথিবীর সমান ঘন। বৃহস্পতির ভিতরকার পাথুরে কঠিনটার প্রসার বাইশ হাজার মাইল; এর উপরে বরফের স্তর জমে রয়েছে ষোলো হাজার মাইল। এই বরফপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল বায়ুস্তর। এত বড়ো বাষ্প-ভরা বাতাসের প্রবল চাপে হাইড্রোজেনও তরল হয়ে যায়। অতএব এই গ্রহে আছে কঠিন বরফস্তরের উপরে তরল গ্যাসের সমুদ্র। আর তার বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর তুষার অ্যামোনিয়াবিন্দুতে তৈরি।

বৃহস্পতি অতিকায় গ্রহ, ওর ব্যাস প্রায় নব্বই হাজার মাইল, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশোগুণ বড়ো।

সূর্য প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে প্রায় বারো বৎসর। দূরে থাকাতে ওর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক বড়ো হয়েছে

সন্দেহ নেই কিন্তু এ চলাও খুবই মন্দ চলনে। পৃথিবী যেখানে উনিশ মাইল চলে এক সেকেণ্ডে, ও চলে আট মাইল মাত্র। কিন্তু ওর আবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরা খুবই জোর বেগে। অত বড়ো বিপুল দেহটাকে পাক খাওয়াতে ওর লাগে দশ ঘণ্টা। আমাদের একদিন একরাত্রি সময়ের মধ্যে ওর দুই দিনরাত্রি শেষ হয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে।

নয়টি উপগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতির পরিবারমণ্ডলী। দশম উপগ্রহের খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু সে-খবর পাকা হয়নি। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে এই উপগ্রহগুলির বৃহস্পতি-প্রদক্ষিণের বেগ অনেক বেশি তেজ। প্রথম চারটি উপগ্রহ আমাদেরই চাঁদের মতো বড়ো। তাদের মধ্যে গ্যানিমিডা পুনিমা এবং ক্যালিস্টো।

বৃহস্পতির সব-দূরের দুটি উপগ্রহ তার দলের অন্যান্য উপগ্রহের উলটো মুখে চলে। এর থেকে কেউ কেউ আন্দাজ করেন, এরা এককালে ছিল দুটো গ্রহিকা, বৃহস্পতির টানে ধরা পড়ে গেছে।

আলো যে এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে তা প্রথম স্থির হয় বৃহস্পতির উপগ্রহ থেকে। হিসাবমতে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ যখন ঘটবার কথা, প্রত্যেক বারে তার কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ, ওর আলো আমাদের চোখে পৌঁছতে কিছু দেরি করে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আলো চলে, এ যদি না হোত

তাহলে এগুলো কতক্ষণের পরে সত্যই অদৃশ্য হইয়াছে। দেখা যায়। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের গ্রহণ দেখে ও গ্রহণের সময়ের কতকগুলো গোলমাল পেয়েছিলেন। সেটা লক্ষ্য করে আলোর বেগ প্রথম হিসাব করা হয়।

বৃহস্পতির নিজস্ব আলো নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহস্পতির নয়-নয়টি উপগ্রহের গ্রহণের সময়। গ্রহণটা কী করে ঘটে দেখো। কোনো এক উপগ্রহ যখন সূর্য থেকে দিকে, তার গ্রহ থাকে আড়ালে আড়াল করিয়া সূর্যের সামনে, আর তাদের মাঝখানে থাকে গ্রহের ছায়ায় উপগ্রহ, তখন সূর্যালোক থেকে বাধা পেয়ে উপগ্রহে লাগে গ্রহণ। কিন্তু মধ্যবর্তী গ্রহের নিজেরই যদি আলো থাকত, তাহলে সেই আলো পড়ত উপগ্রহে, গ্রহণ হোতেই পারত না। আমাদের চাঁদের গ্রহণেও সেই একই কথা। চাঁদের কাছ থেকে সূর্যকে যখন সে আড়াল করে, তখন জ্যোতিহীন পৃথিবী চাঁদকে ছায়াই দিতে পারে, নিজের থেকে আলো জোগাতে পারে না।

বৃহস্পতি গ্রহের পরের পর্যায়ে আছে শনিগ্রহ।

এ গ্রহ আছে সূর্য থেকে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। আর সাড়ে উনত্রিশ বছরে এক পাক দেয় সূর্য প্রদক্ষিণে। শনির দেহ বৃহস্পতির চেয়ে ছোট — এর ব্যাস ৭৫ হাজার মাইল। বৃহস্পতি ছাড়া অন্যসব গ্রহের চেয়ে এর আয়তন

অনেক বড়ো; এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় নয় গুণ। পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে নয়গুণ বড়ো হয়েও একপাক ঘুরে আসতে এর লাগে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও কম সময়। এত জোরে ঘুরছে ব'লে সেই বেগের ঠেলায় এর আকার হয়েছে কিছু চ্যাপটা ধরনের। এত বড়ো এর আয়তন অথচ ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র বেশি। এত হালকা ব'লে এই প্রকাণ্ড আয়তন সত্ত্বেও টানবার শক্তি পৃথিবীর চেয়ে এর বেশি নয়। একটি মেঘের আবরণ একে ঘিরে আছে, যার আকার-বদল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শনির উপগ্রহ আছে নয়টি। সবচেয়ে বড়ো যেটি, আয়তনে সে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো, প্রায় সাত লক্ষ মাইল দূরে থেকে, ষোলো দিনে তার প্রদক্ষিণ শেষ হয়।

শনিগ্রহের বেষ্টনীর পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বেষ্টনীর যেসব অংশ গ্রহের কাছাকাছি আছে তাদের চলন-বেগ বাইরের প্রান্তবর্তী অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেষ্টনী যদি অখণ্ড চাকার মতো হোত, তাহলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হোত। কিন্তু শনির বেষ্টনী যদি খণ্ড খণ্ড জিনিস দিয়ে হয় তাহলে তাদের যে দল গ্রহের কাছে, তাদের জোরে তারাই ঘুরবে বেশি বেগে। এইসব লক্ষ লক্ষ টুকরো উপগ্রহ ছাড়াও নয়টি বড়ো উপগ্রহ ভিন্ন পথে শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

কী ক'রে যে এ গ্রহের চারিদিকে বলয় বা ছোটো-ছোটো টুকরো সৃষ্টি হোলো, সে-সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে মত তারই কিছু এখানে বলা যাক। গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত অনেকটা ডিমের মতো চেহারা হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন টান আর সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়! এই ছোটো টুকরোগুলিও আবার ভাঙতে পারে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে লাখ লাখ টুকরো বেরোনো অসম্ভব নয়। চাঁদেরও একদিন এই দশা হবার কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক গ্রহকে ঘিরে আছে একটি করে অদৃশ্য সীমানার রেখা, তাকে বলে বিপদের গণ্ডি। তার মধ্যে এসে পড়লেই উপগ্রহের দেহ ফেঁপে উঠে ডিমের মতো লম্বাটে আকার নেবে, অবিলম্বে পড়বে ভেঙে। শেষকালে টুকরোগুলো জোট বেঁধে ঘুরতে থাকে গ্রহের চারদিকে। বিজ্ঞানীদের মতে বৃহস্পতির প্রধান উপগ্রহ এই অদৃশ্য বিপদ-গণ্ডির কাছে এসে পড়েছে, আর কিছুদিন পরে সেখানে ঢুকলেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শনিগ্রহের মতো বৃহস্পতির চারদিক ঘিরে তখন তৈরি হবে একটি উজ্জ্বল বেষ্টনী। শনিগ্রহের চারিদিকে যে বেষ্টনীর কথা বলা হোলো তার সৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন যে অনেকদিন আগে শনির একটি উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এর বিপদ-গণ্ডির

ভিতরে গিয়ে পড়েছিল তার ফলে উপগ্রহটা ভেঙে টুকরো হয়ে আজও এই গ্রহের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে আছে বলে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব বেশি না। পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে। তার পরে যখন ঐ বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলেকায় প্রবেশ করবে তখন যাবে টুকরো টুকরো হয়ে, আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীর চারদিক দিয়ে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।

কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জেফ্রেজের মত এর উল্টো। তিনি বলেন চাঁদে পৃথিবীতে দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। অবশেষে চান্দ্রমাসে সৌরদিনে সমান হয়ে যাবে, তখন কাছের দিকে ফিরবার পালা শুরু হবে।

বৃহস্পতির চেয়ে শনি সূর্য থেকে আরো দূরের গ্রহ— কাজেই ঠাণ্ডা আরো বেশি। এর বাইরের দিকের বায়ুমণ্ডল অনেকটা বৃহস্পতির মতো, কেবল অ্যামোনিয়া তত বেশি জানা যায় না, আলেয়া গ্যাসের পরিমাণ মনে হয় বৃহস্পতির চেয়ে বেশি। শনি যদিও পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো, তবু তার ওজন সে-পরিমাণে বেশি নয়। বৃহস্পতির মতো এর বায়ুমণ্ডল গভীর হবার কথা, কেননা এর টান এড়িয়ে বাষ্পের পালাবার পথ নেই। এর ঘনত্বের পরিমাণ অত্যল্প

বেশি থাকলেই এর গড়পড়তা! এমন আয়তনের তুলনায় এত কম। এর ভিতরের কঠিন অংশের ব্যাস ২৪০০০ মাইল, তার উপরে প্রায় ৬০০০ মাইল বরফ জমেছে—আর তার উপরে আছে ১৬০০০ মাইল হাওয়া।

শনিগ্রহের পরের ধাপটিতে আছে য়ুরেনস নামক এক নতুন-খুঁজে-পাওয়া গ্রহ.

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এর আয়তন পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশি। সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূর থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এই গ্রহটা এর অবস্থান এত খুব দূরে আছে যে ভালো দূরবীন ছাড়া একে দেখা যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরি তা জলের চেয়ে একটু কম, তাই পৃথিবী থেকে বহু গুণ বড় হলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র।

১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে।

য়ুরেনস আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই পণ্ডিতেরা য়ুরেনসের গতিবিধি লক্ষ করে স্থির করলেন, এ গ্রহ পথের নিয়ম ভেঙেছে আর একটা কোনো গ্রহের টানে। খুঁজতে খুঁজতে বেরোল সেই গ্রহ। তার নামকরণ হোলো নেপচুন।

সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, প্রায়

১৬৫ বছরে এ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস প্রায় ৩৩,০০০ মাইল, য়ুরেনসের চেয়ে কিছু বড়ো। দূরবীনে শুধু ছোটো একটি সবুজ থালার মতো দেখায়। একটি উপগ্রহ ২ লাখ ২২ হাজার মাইল দূরে থেকে ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় এঁকে একবার ঘুরে আসছে। উপগ্রহের দূরত্ব এবং এই গ্রহের আয়তন থেকে হিসাব করা হয়েছে যে এর বস্তু-পদার্থ জল থেকে কিছু ভারি, ওজনে এ প্রায় য়ুরেনসের সমান। কত বেগে এ গ্রহ মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘুরছে তা আজও একেবারে ঠিক হয়নি।

নেপচুনের আকর্ষণে য়ুরেনসের যে নূতন পথে চলার কথা তা হিসেব করার পরেও দেখা গেল যে য়ুরেনস ঠিক সে-পথ ধরেও চলছে না। তার থেকে বোঝা গেল যে নেপচুন ছাড়া এ গ্রহের গতিপথের বাইরে রয়েছে আরো একটা জ্যোতিষ্ক। ১৯৩০ সালে বেরিয়ে পড়ল নূতন এক গ্রহ। তার নাম দেওয়া হোলো প্লুটো। এ গ্রহ এত ছোটো ও এত দূরে যে, দূরবীনেও একে দেখা যায় না। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিঃসন্দেহে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রহই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে, তাই আলো উত্তাপ পাচ্ছে এত কম যে, এর অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে।

৩৬৮ কোটি মাইল দূর থেকে প্রায় ২৫০ বছরে এ গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

প্লুটো গ্রহটির তাপমাত্রা হবে বরফগলা বিন্দুর ৪১৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পরিমাপের নিচে। এত শীতে অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসও তরল এমন কি নিরেট হয়ে যায়। স্বাভাবিক গ্যাস, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থগুলো জমে বরফপিণ্ড গ্রহটিকে নিশ্চয় ঢেকে ফেলেছে। কেউ কেউ মনে করেন সৌরলোকের শেষ সীমানায় অজস্র ছোটো ছোটো গ্রহ ছিটিয়ে আছে, প্লুটো তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কখনো যাবে কি না বলা যায় না। এখনকার চেয়ে অনেক শক্তিশালী দূরবীন ঐ সুদূরের খবর আনতে যদি পারে তাহলেই সংশয়ের সমাধান হবে।

ভূলোক

দূর গ্রহের আত্মীয়দের ও উপগ্রহদের কিছু কিছু খবর জানা গেছে, কেবল পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে পেরেছি। বাষ্পীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের কাল, স্বাক্ষরচিহ্ন আঁকা পড়েছে।

পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোথাও ফাঁক না থাকাতে সেই চাপটা নীচে ঠেসে বসে শক্ত হোলো, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হোতে থাকল। ফলের সব টাটকা শুকোতে শুকোতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হোতে হোতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে ফলের সব চেহারা অসমান হয় এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু কুঁচকিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা, তেমন সামান্য রকম উঁচুনিচু জাতের নয়। ভিতের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয়নি; তাই তাকে নির্ভর না পেয়ে উপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে উঁচুনিচু হোতে থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়োমানুষের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত

পৃথিবীর বৃহৎ শরীরটার তুলনায় এই পাহাড়পর্বতের উঁচুনিচু মানুষের চামড়ার উপর দাগচিহ্নের চেয়ে কম বই বেশি নয়।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে ঠেলে-ওঠা জমির উঁচুনিচুতে কোথাও নামল গহ্বর, কোথাও উঠল পর্বত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এমনি হয়নি। কেননা তখনো পৃথিবীর তাপে জলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হোলো ঠাণ্ডা, বাষ্প হোলো জল। সেই জলে গহ্বর ভরে উঠে হোলো সমুদ্র।

পৃথিবীর অনেকখানি জলের বাষ্প যেমন করে হোলো জল, কিন্তু হাওয়ার প্রধান গ্যাসগুলো থেকেই রয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যদিও ঠাণ্ডা হোলে তারা তরল হোতে পারে এতটা ঠাণ্ডায় জল যেমন জমে, আমাদের পৃথিবী হোক বরফের চেয়ে শক্ত। কার্বনিক গ্যাসের সঙ্গে-মিশিয়ে অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি।

পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনো একেবারে থেমে যায়নি। তারি দরুন ঠেলায় হঠাৎ কোথাও ফাঁকার জায়গা যদি নিচে থেকে কিছু সরে যায়, তাহলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, দুলিয়ে দেয় পৃথিবীর শরীরকে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নিচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে।

পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে গর্তটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনো অতটা নিচে পর্যন্ত খোঁড়া হয়নি। কয়লার খোঁজে মানুষ মাটির যতটা নিচে নেমেছে সে এক মাইলের বেশি নয়। তাতে কেবল এই খবরটা পাওয়া গেছে যে, যত পৃথিবীর নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয় স্থানভেদে মাত্রাভেদ ঘটে। একসময়ে একটা মত চলতি ছিল, যে, ভূত্বকটা ভাসছে পৃথিবীর ভিতরকার তাপে-গলা তরল ধাতুর উপরে। এখনকার মত হচ্ছে পৃথিবীটা নিরেট, ভিতরের দিকে তাপের বৃদ্ধি দেখা যায় বটে কিন্তু পৃথিবীর স্তরে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, হয়তো তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে। তার অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়। সম্ভবত সে-জায়গাটি খুব গরম, কিন্তু এতটা নয় যাতে ভিতরকার জিনিস গলে যেতে পারে। আন্দাজ করা যাচ্ছে সেখানকার জিনিসটা লোহা আর নিকেল, তারা আছে দুহাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের ঘিরে আছে যে-একটা খোলা, সে পুরু, দুহাজার মাইলের উপরে।

পৃথিবীর সমস্তটাই যদি জলময় হোত তাহলে তার ওজন যতটা হোত, ওজনে ওজনে মিলিয়ে তার চেয়ে তার ওজন সাড়ে পাঁচগুণ বেশি। তার উপরকার তলার পাথর জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি ঘন। তাহলে তার ভিতরে

আরো বেশি ভারি জিনিস আছে বলে নিতে হবে। কেবল যে উপরকার চাপেই তাদের ঘনত্ব বেড়ে গেছে তা নয় সেখানকার বস্তুপুঞ্জের তাপ স্বভাবতই বেশি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বাতাস তার শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন। তার এবং যেসব গ্যাস আছে সে অতি সামান্য। অক্সিজেন-গ্যাস বিশুদ্ধ গ্যাস, লোহার সঙ্গে মিশে মরচে ধরায়, দাহ্যপদার্থের সঙ্গে মিলে আগুন জ্বালায়—এমনি করে বায়ুমণ্ডল থেকে নিয়ত তার অনেক খরচ হোতে থাকে। এদিকে গাছপালারা বাতাসের অঙ্গারাম্ল-গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজনে অঙ্গারটি আদায় ক'রে নিয়ে অক্সিজেনভাগ বাতাসকে ফিরিয়ে দেয়। এ না হোলে পৃথিবীর হাওয়া অঙ্গারাম্ল-গ্যাসে ভ'রে যেত, মানুষ পেত না তার নিশ্বাসের বায়ু।

আকাশের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত হাওয়ার বেশি পরিবর্তন হয়নি। যেসব গ্যাস মিশিয়ে হাওয়া তৈরি তাদের অনেকটাই আরো অনেক উপরে পৌঁছয় না। খুব সম্ভব সবচেয়ে হালকা দুটো গ্যাস অর্থাৎ হেলিয়ম এবং হাইড্রোজেনে মিশোনো সেখানকার হাওয়া।

বাতাসের ঘনত্ব কমতে কমতে ক্রমশই বাতাস অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। বাহির থেকে পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় পৃথিবীর হাওয়ার ঘর্ষণে তা জ্বলে ওঠে, তাদের অনেকগুলিই

এই অঞ্চল পর্যন্ত দেখা দেয় ১২০ মাইল উপরে। ধরে নিতে হবে তার ঊর্ধ্বে আরো অনেকখানি বাতাস আছে যার ভিতর দিয়ে আসছে আমাদের জন্যে এই অঞ্চলের অদৃশ্য দূতী।

সূর্যের আলো ৯ কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহ-বেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হতে তাকে বেগেরই বেশি কষ্ট করবার কথা নয়। যে মুহূর্তে দেখা দিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্তদেশে পৌঁছয় তার আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ছেঁড়াখোঁড়া ছারখার হয়ে যায়। কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় এফ ২ (F 2) স্তর।

সেখানকার বাতাসের পর বাকি সূর্যকিরণ নিচের অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে, সেখানেও পরমাণু ভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তারও নাম দেওয়া হয়েছে এফ ১ (F 1) স্তর।

আরো নিচে আবার এক বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পরমাণু-ভাঙা আরো একটা স্তর হয়ে দেখা দেয়, তার নাম ই (E) স্তর।

সূর্যকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু ভাঙচুরের কাজে সবচেয়ে প্রধান উদ্যোগী। উপরের স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নিচের হাওয়ায় এসে পৌঁছয়। সেইটে আমাদের রক্ষে। বেশি হোলে সইত না।

ভূলোক

সূর্যকিরণ ছাড়া আরো অনেক কণাপ্রবাহ দূর থেকে আসে বাতাসকে অনবরত আঘাত করতে, যেমন উল্কা, তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা ছুটে আসে মহাকাশের ভিতর দিয়ে এক সেকেণ্ডে দশ থেকে একশো মাইল বেগে। হাওয়ার ঘর্ষণে তাদের মধ্যে তাপ জেগে ওঠে, তার মাত্রা হয় তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফারেন-হাইট ডিগ্রি পর্যন্ত। তাতে করে লোহা-পাথরের আলোর ঝাঁক বাষ্প বুদ্বুদ হয়ে আসে, বাতাসের ধুলোর গায়ে প'ড়ে তাদের অস্তিত্বকে চুরমার ক'রে দেয়। এছাড়া আর এক রশ্মিবর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সে কস্‌মিক রশ্মি — বিশ্বে সেই হচ্ছে সবচেয়ে প্রবল শক্তির বাহন।

পৃথিবীর বাতাসে আছে অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুকণা, তারা অতি দ্রুতবেগে ক্রমাগতই ঘোরাঘুরি করছে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত চলছেই। যারা হালকা কণা তাদের দৌড় বেশি। সবার মধ্যে যে সবচেয়ে হালকা তার ছুটোছুটি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্যে পৃথিবীর নাড়ির-আকর্ষণের মায়া থেকে হাইড্রোজেনরাই সুযোগ মত ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে দৌড় দিচ্ছে। কিন্তু ওজনের ভারে অক্সিজেন নাইট্রোজেনের অণুকণার গতি কখনো সেই দরকারি পলাতকের বেগ পায় না। সেই কারণে পৃথিবীর বাতাসে তাদের টিকে

ঘটেনি। কেবল তরুণ বয়সে যে হাইড্রোজেন ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রধান গ্যাসীয় সম্পত্তি, ক্রমে ক্রমে সেটার অনেকখানিই সে খুইয়ে ফেলেছে।

বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা পাখি শুধু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে ভেসে বেড়ায়, বুঝতে পারি পাখিকে নিজের দিকে পাবার একটা মমতা আছে বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। এই হাওয়ার চাপ একফুট লম্বা ও একফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাড়েসাত মণ। একজন সাধারণ মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মণের উপর। অথচ তা টের পাইনে। যেমন উপর থেকে তেমনি নিচের থেকে, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে যে হাওয়া আছে তার থেকে সমানভাবে বাতাসের চাপ আর ঠেলা লাগছে বলে বাতাসের ভার আমাদের পীড়া দিচ্ছে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আপন আবরণে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে মহাশূন্যের প্রবল ঠাণ্ডাটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার উড়ুনি নেই তাই সে সূর্যের তাপে ফুটন্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময় যখনি পৃথিবী তাদের উপর ছায়া ফেলে তখনি দেখতে-দেখতেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাওয়া থাকলে

তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। উপদ্রব কেবল এইমাত্র নয়, বাতাস নেই ব'লে সে একেবারে বোবা, কোথাও একটু শব্দ হবার জো নেই। বিশেষভাবে বাধা পেলে বাতাসে নানা আয়তনের স্পন্দ ঢেউ ওঠে, সেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেইসব ঢেউ নানারকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে সাড়া দিতে থাকে। আরো একটি কাজ আছে বাতাসের। কোনো কারণে রৌদ্র যেখানে কিছু বাধা পায় সেখানে ছায়াতেও যথেষ্ট আলো থাকে, এই আলো বিছিয়ে দেয় বাতাস। নইলে যেখানটিতে রোদ পড়ত কেবল সেইখানেই আলো হোত। ছায়া ব'লে কিছুই থাকত না। ঠিক আলোর কিনারাতেই থাকত ঘোর অন্ধকার। পাহাড়ের মাথার উপর রোদ্দুর উঠত চোখ ধাঁধিয়ে আর তার তলা হোত মিশমিশে কালো, দিনের বেলা খাঁ খাঁ করত দুই পহরের রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত দুই পহরের অমাবস্যার রাত্রি। প্রদীপ জ্বালার কথা চিন্তা করাই হোত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যেই সব-কিছু জ্বলে।

গাছের সবুজ পাতায় থাকে গোলাকার অণুকণা, তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল ব'লে একটি পদার্থ আছে—তারাই সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের নানা বস্তুতে। তাদের

শক্তিতেই তৈরি হচ্ছে বনে ফসলে আমাদের খাদ্য, আর গাছের ডালেতে কাঠিন্য ওঠে। পৃথিবীর বাতাসে আছে অঙ্গারদ্বিঅক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে। উদ্ভিদবস্তুতে যত প্রকার পদার্থ আছে, যার থেকে কয়লা হয়, সমস্ত এই গ্যাস থেকে নেওয়া। এই অক্সিজেনী আঙ্গারিক গ্যাস মানুষের দেহে কেবল যে কাজে লাগে না তা নয়, একে শরীর থেকে বের করে দিতে না পারলে আমরা মারা পড়ি। কিন্তু গাছ আপন ক্লোরোফিলের যোগে এই অক্সিজেনী অঙ্গারিকের অঙ্গার মিশিয়ে খনে খনে আমাদের জন্যে যে খাবার বানিয়ে তোলে, সেই খাদ্যের ভিতর দিয়ে সূর্যতাপের শক্তিকে আমরা প্রাণের কাজে লাগাতে পারি। এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাছের আছে। গাছের থেকে আমরা নিই হরণ করে। পৃথিবীতে সমস্ত জন্তু মিলে যে অক্সিজেনমিশ্রিত আঙ্গারিক বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় সেটা সমস্ত গাছপালার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আগুন জ্বালানি থেকে, উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের পচানি থেকেও এই বাষ্প বাতাসে ছড়াতে থাকে। পৃথিবীতে কলকারখানায় হাজার কাজে কয়লা যা পোড়ানো হয় সে বড়ো কম নয়। তার থেকে উদ্ভব হয় বহু কোটি মন অঙ্গারদ্বিঅক্সিজেনী গ্যাস। গাছের পক্ষে যে খাওয়ার জোগান দরকার সেটা এমনি করে জুটছে অনেক ত্যাজ্য পদার্থ থেকে।

বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলেনি, একত্রে আছে, এক হয়নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চারগুণ আছে নাইট্রোজেন। কেবলমাত্র নাইট্রোজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরত জন্তুরা! কেবলমাত্র অক্সিজেনে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল জুড়ে স্যাৎসেঁতে। যে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়।

উপরতলার বায়ুমণ্ডল ছাড়া পরমাণুর বৈদ্যুত ঝড়ের কথা পূর্বে বলেছি। সে ছাড়া সহজ বাতাসের দুটো স্তর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, তার বৈজ্ঞানিক নাম troposphere, বাংলায় একে ক্ষুব্ধ স্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এর উচ্চতা নয়। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের মাপে এই ক্ষুব্ধ স্তরের উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আছে বাতাসের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এ স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গায়ে লেগে আছে বলে এই স্তরে সর্বদা পৃথিবীর উত্তাপের ছোঁয়াচ লাগে। সেই উত্তাপের কমায় বাড়ায় হাওয়া এখানে

ক্রমাগত ছুটোছুটি করে। এই স্তরেই তাই ঝড়বৃষ্টি। এর আরো উপরে যে স্তর, পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড় তুফান চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere, বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধ স্তর।

আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তার পরে কোটি কোটি বৎসরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হোলো, চাঁদও হোলো তাই।

২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭⅓ দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩।০ গুণ ভারি। অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম বলে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে এত বড়ো দেখায়। ষাটটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। দূরবীনে চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে এ তৈরি। এর উপরে আছে বড়ো বড়ো গহ্বর আর বড়ো বড়ো পাহাড়।

পৃথিবীর টানে চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এক পাক ঘুরতে তার এক মাসের কিছু কম লাগে। গড়পড়তায়

তার পরিধিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় মাইলের বেশি নয়। পৃথিবী ঘোরে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আপন মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘুরতে চাঁদের একমাসের সমানই লাগে। তার দিন আর বৎসর হল একই রকম দীর্ঘ মনে হবে।

চাঁদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের পরিবেগ যদি সেখানে সেকেণ্ডে দেড় মাইল হয় তা হলে চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে তা ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। চাঁদ যে-নিয়মে অতিমাত্রায় তাপ পোহায় তাতে তার তেজে ওর পিঠের উপরে হাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠাতে চাঁদ তার বাতাসের অণুদের ধরে রাখতে পারেনি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের অণু পরম চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে বলে আমরা জানিনে। চাঁদকে একটা তালপাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।

রাতের বেলায় যাদের আমরা খসে-পড়া তারা বলি সেগুলো যে তারা নয় তা আজ আর কাউকে বলতে হবে না। সেই উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর টানে দিনরাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর উপরে। ওর অধিকাংশই বাতাসের ঘেঁষ লেগে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো বড়ো আয়তনের,

তাঁরা ছুটতে ছুটতে মাটিতে এসে পৌঁছয়, সেখানে মস্ত দাগ কেটে, চারদিকে যা পায় দেয় ছারখার ক'রে।

চাঁদেও ক্রমাগত এই উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই ক'রে দেবার মতো একটু হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে চাঁদের সর্বাঙ্গে। বেগ কম নয়, সেকেণ্ডে প্রায় তিরিশ মাইল, সুতরাং যা মারে প্রবলবেগে ঠেকে।

চাঁদে বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি একদা উৎসারিত অগ্নি উদ্গম থেকেই। যে গলন্ত পদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া জল না থাকায় এবং যুগ যুগেও তাদের কোনো বদল হতে পারেনি। ছাইচাপা আছে ব'লে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ ক'রে খুব বেশি নিচে যেতে পারে না, আর নিচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।

চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, আর যেদিকে আলো পড়ে না, সে, এত ঠাণ্ডা হয় যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রি নিচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের উপরে পড়ে তখন তার উত্তাপ কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমে যায়।

হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ থাকায় সূর্যের আলো নিচে প্রবেশ করতে পারে না ব'লে সঞ্চিত কোনো উত্তাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি এর উত্তাপ কমে

আছে। এসব প্রমাণ থেকে বলা হয় যে, আগ্নেয়গিরির ছাই ঢেকে রেখেছে চাঁদের প্রায় সব জায়গা।

চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে, সেখানে জোয়ারভাঁটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরের অনেকগুলি ব্যাধির বাড়াবাড়ি ঐ চাঁদের জোরে ঘটে। বাতের রোগীরা ভয় করে অমাবস্যা-পূর্ণিমাকে।

আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারের তেজের উৎপাত; কোথাও অগ্নিগিরি ছুঁড়ছে তপ্ত বাষ্প, উগরে দিচ্ছে তরল ধাতু, কোথাও ফোটাচ্ছে গরম জলের। নিচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড় পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হোলো তখন অশান্ত আদিযুগের মারো-কাটো-মরো অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমশ মনের উদ্ভব হোলো তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল

অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানারকমের প্রবল আঘাতে তাদেরই উলটপালট ক'রে ভাঙাচোরা দিয়ে নদী পাহাড় সমুদ্রের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তারি সঙ্গে মন। এদের পূর্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।

নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ যেমন নীহারিকায় তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকের প্রথম যে প্রকাশ দেখা দিল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন,—তখনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজ্‌ম। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগুনের বাষ্পে, তেমনি কতযুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি একটি পিণ্ড জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অ্যামীবা; আকারে অতি ছোটো; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষু হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত ক'রে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেই সাময়িক পা দিয়ে সেটাকে টেনে নেয়। পাকযন্ত্র বানিয়ে নেয় দেহের একটা অংশে। নিজের সমস্ত দেহটাকে ভাগ

ক্রমে ক্রমে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই জীবাণুরই আর এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারদিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি শূন্য দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জমে জমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি হয়েছে।

বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি সম্মিলিত বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হোলো। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাহির থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা, জন্মের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।

এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবদ্ধ হোতে থাকল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহু কোটি তারার সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমবায়ে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহসংঘ একটি প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা এতক্ষণ নক্ষত্রলোক সূর্যলোকের কথা আলোচনা ক'রে এসেছি। তার

চেয়ে বহুগুণ বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উত্তাপ তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতিক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সঙ্গে মনের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে এ-কথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই, এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু এ-কথা বলতে মন যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগতের একমাত্র ব্যতিক্রম।

উপসংহার

একথা জগতের সকলের চেয়ে আশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে যেদিন পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল তার গোপনে। যুগে যুগে অপরূপ শিল্পসম্ভারশালী তার সৃষ্টিকর্ম নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজন করবার, শোধন করবার, অভিনবতর কর্মযন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, কেউ তার কিনারা পাচ্ছে না। অবিশ্রামপরিবর্তনশীল জীব-কোষগুলি বংশাবলীক্রমে যথাযথ পথে সমষ্টি বাঁধছে জীব-দেহে, নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; নিজের ভিতরকার উদ্যমে জানি না কী ক'রে দেহক্রিয়ার এমন আশ্চর্য কর্তব্য বিভাগ করছে। যে কোষ পাকযন্ত্রের, তার কাজ একরকমের, যে কোষ মস্তিষ্কের, তার কাজ একেবারেই অন্যরকমের। অথচ জীবাণুকোষগুলি মূলে একই। এদের দুরূহ কাজের ভাগ-

বাটোয়ারা হোলো কোন্ হুকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নামে একটা সামঞ্জস্য সাধন করল কিসে? জীবাণুকোষের দুটি প্রধান কাজ আছে, বাইরে থেকে খাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অনুরূপ জীবনকে উৎপন্ন ক'রে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবল প্রয়াস গোড়াতেই এদের উপর ভর করল কোথা থেকে।

প্রাণের দিকে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জন্তুর অভিপ্রায়ের ভূমিকা? মন এই সব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়। পাথরে লোহায় গ্যাসের পিণ্ডের মধ্যে তা জানার সম্পর্ক নেই। এই অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে—অতি ক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে।

পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে প্রাণের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়-বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে। অনেককাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ

প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে এবং ক্রমে ক্রমে উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।

পণ্ডিতেরা বলেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমাগতই ক্ষয় হচ্ছে এ-কথা চাপা দিয়ে রাখা চলে না। মানুষের দেহের মতোই তাপে দিচ্ছে জগতের দেহের শক্তি। তাপের ধর্মই হচ্ছে সে খরচ হোতে হোতে ক্রমশই নেমে যায় তার উষ্ণ। সূর্যের উপরিতলের স্তরে যে তাপশক্তি আছে তার মাত্রা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রির উপরে ছয় হাজারের কোঠাতে। তারই কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে বাতাস চলছে, জল পড়ছে, প্রাণের উদ্যমে জীবজন্তু চলাফেরা করছে। সময় তো বুঝেছি, একদিন উত্তাপের শক্তি মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেলে আবার তাকে টেনে নিয়ে এসে কাজে লাগাবার যোগ্য করবে কে। একদিন আমাদের দেহের সদাচঞ্চল তাপশক্তি চারিদিকের সঙ্গে একেবারে সমান হয়ে যখন মিলে যায়, তখন কেউ তো তাকে জীব-যাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পারে না! জগতে যা ঘটছে যা চলছে, পিঁপড়ের চলা থেকে আকাশে নক্ষত্রের দৌড় পর্যন্ত সমস্তই তো বিশ্বের হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্ক লেখা

ছিটকে। সে সময়টা তরলরূপেই হোক একদিন পিণ্ডের কিম্বা খণ্ডের উদ্গিরণ থেকে তার তাপের সম্বল ছড়িয়ে পড়বে শূন্যে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা নিজের মতামতের পর্যায় বদলাচ্ছিল।

আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও যেন বেশি কম পেয়ে পণ্ডিতেরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন। অনাদির মধ্যে কোথাও থেকে আরম্ভ হোলো। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অনির্দেশ্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, ঘুরে আর ঘুরে চাকার মতো।

সৌরলোকের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির ভিতর রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা; বিভিন্ন গ্রহ, চক্রপথে প্রায় একই সমক্ষেত্রে থেকে, একটা সুনির্দিষ্ট আবর্তে ধরা পড়ে একই দিকে চলেছে, সূর্যপরিক্রমার পালা শেষ করছে। সৃষ্টির গোড়ার কথা যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা কেউই এদের মিলকে আকস্মিক বলে মেনে নিতে পারেননি। যে-মতবাদ গ্রহলোকের এই শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করতে পেরেছে তাই প্রাধান্য পেয়েছে সকলের বেশি। যেসব মতবাদ নিয়ে সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টি তাদের যুক্তিবোধের ধারার ভিতর একটা প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব মতবাদকে

গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। তিনজনের গরমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সেই মতকেই দিতে হয়েছে বাতিল করে। পরিক্ষেত্রের মাত্রা প্রায় ঠিক রেখে যে দুখানি মতবাদ এতকাল টিকে ছিল তাদের বিরুদ্ধেও নূতন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকার Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর Henry Norris Russell সম্প্রতি জীন্স ও জিফ্রিসের মতবাদের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদেরও বিদায় নিতে হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে, পূর্ববর্তী বাতিল-করাদের পংক্তিই হবে এদের স্থান। নক্ষত্রের সংঘাতে গ্রহলোকের সৃষ্টি হলেও সূর্য থেকে যে-টানাসূত্র বের হয়ে আসত তার তাপমাত্রা এত বেশি হোত যে এই বাষ্প-সূত্রের নিবিড় অংশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু তাদের পাশ কাটিয়ে দিয়ে এই টানাসূত্র যদি হয় একটা স্থিতি পেতে চাইত। এই দুই বিরুদ্ধশক্তির ক্রিয়ায়, যুক্তি আর বলবের টানাটানিতে কার জিত হবে তাই নিয়েই Henry Russell আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে দুর্বোধ্য গণিতশাস্ত্রের হিসাব থেকে মোটামুটি প্রমাণ হয়েছে যে টানসূত্রের প্রত্যেকটি পরমাণু তেজের প্রবল আঘাতে বিবাগী হয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে পড়ত, জমাট বেঁধে গ্রহলোক সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হোত না। যে-বাধার কথা

তিনি আলোচনা করেছেন ডাঃ জিন্স ও মিলিকানের প্রচলিত মতবাদের মূলে এসে কঠোর আঘাত ক'রে তাদের আশু ভূমিসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে।